বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মানবাধিকার

মোহাম্মদ আলী মনসুর

বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা
ও
মানবাধিকার

মোহাম্মদ আলী মনসুর

ইখওয়ান লাইব্রেরী
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৩২৩৮

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মানবাধিকার

মোহাম্মদ আলী মনসুর
সিনিয়র রিপোর্টার
দৈনিক খবরপত্র
১ নং কলেজ স্ট্রীট, (৩য় তলা), ঢাকা - ১২০৫
ফোন ঃ ৯৬৭৩৫০০, ফ্যাক্স ঃ ৯৬৭১৭৭৭

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ লেখক ও প্রকাশকের যৌথ

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ ইং

প্রকাশক ও পরিবেশক
ইখওয়ান লাইব্রেরী
৩৪/২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
[ইখওয়ান লাইব্রেরীর পক্ষে আনোয়ার জাহিদ কর্তৃক প্রকাশিত]

মুদ্রণে ঃ **দি পলাশ প্রিন্টিং প্রেস**
৭৮/৩/২, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা - ১২০৩

মূল্য ঃ ৪৫·০০ (পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।

Bicher Bivager Jobab Diheeta-O-Manobadiker (Judiciary Answering & Human rights) Written by Mohammad Ali Monsur Published by Anowar Zahid, Ikhwan Library 34/2, North Brook Hall Road Bangla Bazar, Dhaka – 1100

Price : Tk – 45·00 (Fourty five) Only U.S $ - 1 (One)

www.pathagar.com

মা-বাবা'র পুণ্য স্মৃতি'র উদ্দেশ্যে

-মোহাম্মদ আলী মনসুর

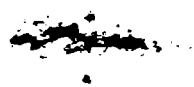

www.pathagar.com

তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদন্ড, যাতে তোমরা সীমা লংঘন না কর তুলাদন্ডে। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম কর এবং ওজনে কম দিও না।

আল-কুরআন, সুরাহ্ আর রাহমান, আয়াত ঃ ৭ - ৯

"And the heaven; He has raised it hight and He has set up the Balance. In order that you may not transgress (due) Balance. And observe the weight with equity and do not Make the balance Deficient"

- Al-Qur'an, Surah AR-Rahman, Verse : 7 - 9

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৭
লেখকের কথা	৯
প্রেক্ষাপট	১১
আইনের শাসনের আয়নায় বাংলাদেশ	২১
আমাদের বিচার ব্যবস্থার খন্ডচিত্র	২৪
বিচারের প্রতি অনাস্থায় অন্ধকার যুগে স্বদেশ	৩০
অপরাধীরা যেভাবে আইন আদালতকে পরোয়া করে না	৩২
আদালত অবমাননা আইন : যুক্তির সমাধিস্থল	৩৫
মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিচার বিভাগের - 'না'	৩৮
মত প্রকাশের স্বাধীনতায় পরস্পর বিরোধী আইনের টানা হ্যাঁচড়া	৪০
বিচারক কি সমালোচনার উর্ধ্বে?	৪২
বিচারকগণ কি আইনের উর্ধ্বে ? দেড়'শ বছরের প্রতারণা	৪৪
বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা কেন ?	৪৮
দু'জন বিচারকের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের আইন আদালত	৫০
ঐতিহাসিক সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে	৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

বিচার বিভাগ নিয়ে কেউ তেমন উচ্চবাচ্য করতে চায়না প্রথমতঃ বিচার বিভাগের প্রতি শ্রদ্ধাবশত; দ্বিতীয়ত বিচার বিভাগ এবং বিচারকদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অনবহিত বিধায়।

এমতাবস্থায় একজন অনুসন্ধানী লেখকের তাবত গুনে গুনান্বিত মোহাম্মদ আলী মনসুর-এর বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মানবাধিকার লেখাটা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে মনসুর সময়োপযোগী একটি প্রচন্ড পরিশ্রমের কাজ করেছে। আইন বা বিচার বিভাগের সাথে তার কোন সম্পৃক্তি নেই; কিংবা আইন শাস্ত্রের উপর তার নেই কোন একাডেমিক ডিগ্রী। হয়তো অনেকে তার পুরো লেখাটাকে 'লে ম্যানস ভিউ' বলেও আখ্যায়িত করতে পারেন। কিন্তু তাতে এই লেখার প্রতিপাদ্যের যে গ্র্যাভিটি তা অস্বীকার করা যাবেনা এবং আমাদের বিচার বিভাগে বিদ্যমান অতলান্তিক সমস্যারও কোন কুল কিনারা করা যাবেনা।

ইংরেজ দার্শনিক থমাস ফুলার বলেছেন 'রিজিড জাষ্টিস ইজ দি গ্রেটেষ্ট আনজাষ্টিস।' যার ভাবার্থ করলে দাড়ায় বিচার পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরে অনুসৃত অনমনীয়তা বস্তুত অবিচারেরই নামান্তর। ফরাসী দার্শনিক আঁনাতোলে ফ্রান্স বলেছেনঃ 'ওয়ানচ দি ল'জ আর জাষ্ট, দ্যান ম্যান উইল বি জাষ্ট।' অর্থাৎ আইন যদি সঠিক হয় তাহলে মানুষও ঠিক হয়ে যায় কিংবা ঠিক ভাবে চলে মার্কিন মানবতাবাদী মার্টিন লুথার কিং বলেছেন 'ইনজাষ্টিজ এনি হয়ার-ইজ এ থ্রেট টু জাষ্টিস এভরি হয়ার।' অর্থাৎ যে কোন জায়গায় অবিচার ঘটলে তা সমস্ত জায়গার বিচারকে হুমকির মুখে ফেলে। আমাদের বিচার ব্যবস্থায় বিদ্যমান চরম দুরাবস্থায় উপরোক্ত তিনটি উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় প্রনিধানযোগ্য বলে আমি মনে করি।

আমাদের বিচারকরা একপেশে কিংবা শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণে একেবারেই সংকীর্ণ মনোভাবপন্ন কিংবা ক্ষমতার অপব্যবহার বা যথেচ্ছাচারে অভ্যস্থ - এমন ধরণের সাধারণ্যে বিদ্যমান নানাবিধ অভিযোগের কথা আমি বলিনা। কিন্তু বিচার সম্পন্নকরণে যে সব আইন অমাদের বিচারকরা প্রয়োগ করছেন; সে সকল আইন-কানুন কি আজকের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সঠিক কিংবা সময়োপযোগী ? আইন সঠিক না হলে মানুষ ঠিক থাকবে কিভাবে ? আর সে সবের প্রয়োগে বিচার বিভাগ এবং সম্মানিত বিচারকরা অনমনীয় থাকলে তারাও অবিচার করার অপবাদে দুষ্ট হতে বাধ্য।

আমাদের বিচার পদ্ধতিতেও রয়েছে অন্তহীন সমস্যা। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত যে কয়টি ধাপ রয়েছে তা মাড়ানো সংকটাক্রান্ত

www.pathagar.com

বিচারপ্রার্থী মানুষদের অনেকের এক জীবনেও সম্ভব হবার নয়। এটা সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহ কারো নেই। এর অপনোদন হওয়া দরকার।

মনসুর তার লেখাতে কিছু কিছু ঘটনার অবতারণা এমনভাবে করেছেন, যেগুলো হয়তো পেশাগত সাযুজ্যতা এবং নান্দনিকতার আলোকে দুর্বল বয়ান; কিন্তু তার বয়ান এর নিগলিতার্থ অত্যন্ত গভীর। আশা করা যায় যে, পাঠক সমাজ তা হয়তো হৃদয়ঙ্গম করবেন যথাযথভাবে।

মনসুরকে সাংবাদিকতা পেশায় আমি উৎসাহিত এবং নিয়োগ করতে গিয়ে তার মধ্যে এক ধরণের অন্তর্ভেদী অনুসন্ধিৎসু মনের প্রমান পাই। এই লেখাটার ব্যাপারে তার নিরতিশয় উৎসাহ আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য বিচার বিভাগের কিছু কিছু 'অবিচার' এর একজন ভুক্তভোগী সে নিজেও-যা সন্দেহাতীতভাবেই এই লেখার পিছনে তাকে তাগিদ যুগিয়েছে।

আমাদের বিচার ব্যবস্থার অর্গলগুলো অনেকের জীবনের অনেক অবিচারের জন্য দায়ী। আমাদের বিচারকদের সময়ে আইনের এবং এর ফাঁক-ফোকরের গভীরে যাবার অনীহাও সমাজে অনেক সমস্যাকে জিইয়ে এবং ক্ষেএ বিশেষে বাড়িয়ে চলেছে। এরও অপনোদন হওয়া দরকার। এ অপনোদনে হয়তো আমাদের বিচারকরা অনেক সময় পথ হাতড়াতে থাকেন, পথ হাতড়ান রাজনীতিবীদ ও অন্যান্য পেশার লোকজনও; কিন্তু কেউ পথ খুঁজে পায়না। বরং আইনের পর আইন প্রণয়ন হয়েই চলছে। মনসুর সে কারণে যথাযর্থই বলেছে যে, দেশটিকে আইন এর জঙ্গলে পরিণত করা হয়েছে।

এই বই আমাদের বিচার ব্যবস্থার সংকট মোচনে কিছুটা হলেও কাজে দিবে; যদি সত্যি সত্যিই সংবেদনশীল মন দিয়ে সর্বশ্রেণীর সমাজ নেতারা এটা মূল্যায়ন করেন।

আমি এই বই ও লেখকের সর্বাত্মক সাফল্য প্রতাশা করি।

চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক
সম্পাদক, দৈনিক মিল্লাত ও
দৈনিক বিকেলের কাগজ।

ঢাকা, পহেলা ফেব্রুয়ারী, দুই হাজার তিন।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

বিশ্বে বাংলাদেশ এতো হত-দরিদ্র কেন; স্বাধীনতার পর থেকে প্রশ্নটি প্রায়ই আমার হৃদয়ে গুমরে মরতো। এ ব্যাপারে ডান-বাম, গণতন্ত্রী-সমাজতন্ত্রীদের তত্ত্ব, তথ্য, উপমা, ব্যাখ্যা কোনটাই আমার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। যে জাতি জীবন বাজি রেখে উদ্ধতভাবে লড়ে রক্তের সমুদ্রে অবগাহন করে স্বাধীনতা এনে স্বাধীনতার পর ঝিমিয়ে পড়বে; সে জাতির মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তো এমন কথা ছিল না ? জাতির সামগ্রিক নেতৃত্ব যে দুর্নীতিগ্রস্ত তাই বা হয় কি করে ? এ জাতি'র স্বাধিকারের দাবীতে বছরের পর বছর শেখ মুজিব লড়ে স্বাধীনতার পর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তিনি জনগণের স্বাধিকার হরণ করলেন কেন? আর কেনই-বা তিনি পরাস্ত হয়ে জীবন দিয়ে এই ব্যর্থতার দায় পরিশোধ করলেন ?

জাতি'র চরম সংকট মুহূর্তে নির্ভীক সেনা সদস্য জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব, স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান, সবচেয়ে পরিশ্রমী প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাতির হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া, দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে তাঁর নানা সুচিন্তিত পদক্ষেপের মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তাঁকে হত্যা করার ঘটনা আমাকে আরো ভাবিয়ে তোলে। এছাড়া শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক , হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের নিখাদ দেশপ্রেম প্রমাণিত হবার পরেও এ দেশের দারিদ্র্যতার জন্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকে এককভাবে ও ঢালাওভাবে অপবাদ বা দোষ দিতে কিছুতেই মন সায় দেয়নি। তাহলে অন্য কোথাও যেন একটা কিছু আছে? তবে কোথায় সেই রহস্যের উৎস-তা আবিষ্কার করতে পারিনি বহু বছর। বছরের পর বছর অন্ধকারে হাতড়ে ফিরেছি শুধু।

পাশাপাশি আমাদের পরিবারের উপর নেমে আসা বিপর্যয়, সহায়-সম্পত্তি বেদখল এবং অসত্য অভিযোগে দু'দফায় প্রায় তিন মাস কারাগারে বন্দী জীবন আমাকে প্রায় বিপর্যস্ত করে ফেলে। স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা কেন আমার জান-মালের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ, প্রশ্নটি আমায় আবারো তাড়া করে ফিরে। সাংবাদিকতা পেশায় আসার পর মিল্লাত পত্রিকা সম্পাদক আমাকে দায়িত্ব দেন রাস্তার দরিদ্র মানুষদের জীবনধর্মী সচিত্র প্রতিবেদন লিখতে। বঞ্চিত মানুষদের সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে তাদের উপর ক্ষমতাবানদের অবিশ্বাস্য নির্মম নির্যাতন, সহায়-সম্পদ লুট ও বিচার বঞ্চনা'র লোমহর্ষক সব বর্ণনা পাই যা পত্রিকার কলামে প্রকাশিত হতে থাকে। এতে আমি আমার বিবেচনায় এ দেশের দারিদ্র্যতার মূল উৎসের সন্ধান পাই এবং নিশ্চিত হই, এ দেশের যে কোন

www.pathagar.com

রাষ্ট্রনায়কের সব অর্জন নস্যাৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য বানচাল করতে মূলত এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাই দায়ী।

শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-যে দেশে বিচার নেই, সে দেশে সমস্যারও সমাধান নেই। সমস্যা চিহ্নিত করার পর প্রয়োজনীয় নোটসহ পত্রিকা কাটিং রাখতে থাকি-যা গত ১৭ বছরে স্তূপাকৃতি হয়ে ওঠে। সংশ্লিষ্ট আইন বইগুলোর গভীরে অনুসন্ধান করে দেখি, এতে প্রায় সর্বত্র রয়েছে ঔপনিবেশিক বৃটিশদের প্রচুর শঠতার ছোঁয়া। এসব তথ্য সংগ্রহের পর তা জাতির সামনে প্রকাশ না করা হবে বিরাট অপরাধ; এই বিবেচনাবোধ বইটি রচনায় আমাকে তাড়িত করেছে।

বাস্তব জীবন ঘনিষ্ঠ বইটি মূলত নাগরিক জীবনের ভয়ংকর অভিজ্ঞতারই সার সংক্ষেপ মাত্র। বইটিতে কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা সংশোধনে ও পাঠকের অন্য কোন সুপরামর্শ থাকলে তা সাদরে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। বইটির লেখায় আমার প্রিয় দেশবাসীর কারো যদি কোন উপকার হয়, তাহলে আমার ক্ষুদ্র এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

দৈনিক মিল্লাত সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, দৈনিক খবরপত্র সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল মামুন, বার্তা সম্পাদক এ,ডি,এম সাদ বিন রাবী, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মোহাম্মদ আকবর হোসেন, সহকারী সম্পাদক কালাম আজাদ, সম্পাদনা সহকারী আতিকুর রহমান চৌধুরী, আলী হোসেন তালুকদার, এডভোকেট শেখ রেজাউল করিম, এডভোকেট নির্মলেন্দু ধর, মানবাধিকার বাস্ত বায়ন সংস্থা'র পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) মাহবুব আলম কমল ও গবেষণা সহকারী কাজী আতাউর হোসেন আরমান, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এলাহী নেওয়াজ খান সাজু, আমার মামা আব্দুল মান্নান পাটোয়ারী ও খালা লাকি আফিন্দি, বন্ধুবর রোকন আহমেদ এবং সাংবাদিক কাজিম রেজা, আবু তাহের মোস্তাকিম, রেজা রায়হান, ফরহাদ খাঁ, জাহাঙ্গীর ফিরোজ, আলম মাসুদসহ এ বইটি লেখায় যারা আমাকে নৈতিক সমর্থন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, তারা আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেই রাখলেন। আর এই বই প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব স্কন্দে নিয়ে অমাকে চিরজীবনের জন্য কৃতজ্ঞ করলেন ইখওয়ান লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ।

এ বইটি উৎসর্গ করা হলো তাদের যারা এদেশের সেই কোটি কোটি হতভাগ্য মানুষ,-যারা ঔপনিবেশিক সিস্টেমের যাঁতাকলে পড়ে শহীদ হয়েছেন এবং এখনো যারা লাঞ্ছিত , বঞ্চিত ও সর্বস্ব হারিয়ে অতি কষ্টে বেঁচে আছেন।

মোহাম্মদ আলী মনসুর

ঢাকা ঃ ১ জানুয়ারী, ২০০৩

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপট

যে কোন উন্নয়নকামী দেশের দেশপ্রেমিক সরকারের মূল কর্তব্য হচ্ছে জনসাধারণের মঙ্গল বিধান ও সমস্যার কল্যাণকামী সমাধান। এর ফলে শুধু জনসাধারণই নয়, সরকারও তাদের সমর্থন পেয়ে উপকৃত হয়। সরকারের সাথে লাভবান হয় সমগ্র দেশবাসী। কিন্তু আমাদের অতীত খুব সুখের নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী শাসকগণের অনেকের আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও গত ৩১ বছরে সত্যিকারার্থে এদেশবাসী সুখের মুখ দেখেনি কখনো। তা হলে এদেশ এতোদিনে হতে পারতো জাপান, সিঙ্গাপুরের মতো সমৃদ্ধ দেশের কাছাকাছি। এই ব্যর্থতার জন্য পুরোপুরিভাবে দায়ী করা হয়ে থাকে দেশের রাজনীতিকে। অথচ এ ব্যর্থতার আড়ালে অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের মান্ধাতার আমলের আইন ও বিচার ব্যবস্থা; কিন্তু তা আলোচনায় এসেছে খুব কমই। ফলে ৩১ বছরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিচার ব্যবস্থার খুটিনাটি রপ্ত করার আগেই একের পর এক বিদায় নিয়েছেন।

রাজনৈতিক দলগুলোর পারস্পরিক কলহ বিবাদ-স্থায়ী আসন করে নেয়ায় তারা কেউ এদিকে মনযোগ দেবার সুযোগ পাচ্ছেন না। সরলপ্রাণ দেশবাসী এসব পুরানো আইন সংস্কারের জন্য অতীতে যাদের নির্বাচিত করেছিলেন, তারা হয় জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন নতুবা তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে আজকের প্রতিশ্রুতিশীল জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব কালই পরিণত হচ্ছেন ইতিহাসের আবর্জনায়।

প্রায় আড়াই শতাব্দী আগে ১৭৫৭ সালে বৃটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ভারত জবর দখল করার পরবর্তীকালে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্বার্থ সংঘাতের ফলশ্রুতিতে এসব ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার প্রক্রিয়া বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। তারা তাদের দুষ্কর্মকে দিয়েছিল আইনের ভিত্তি। শাসিতের জীবনের প্রতি দয়ামায়া, শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা বা বিনয় নয়, বরং আতংকই ছিল রাষ্ট্রকে পদাবনত ও গণমানুষকে বাধ্য রাখার ঔপনিবেশিক আইনের মূখ্য কলাকৌশল। ভারতের গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপনের মাধ্যমে বৃটিশ ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন।

১৭৭৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এটা খুবই বিস্ময়কর কাকতালীয় ঘটনা যে, আজকের আদালতে ব্যবহৃত ন্যায় বিচারের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ওয়ারেন হেষ্টিংস এরই অবদান; আর হেস্টিংস নিজেই দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার করেছেন অনৈতিক কাজে । তিনি পরস্ত্রী'কে দাঁড়িপাল্লায় বসিয়ে স্বর্ণের

www.pathagar.com

দামে খরিদ করেছিলেন। "১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে তার অধস্তন কর্মচারীর পরম সুন্দরী স্ত্রী কয়েক সন্তানের জননী ব্যারোনেস আন্না মারিয়া ইমহোফ এর সাথে আট বছর লিভ টুগেদার করার পর তিনি তাকে বিয়ে করেন এবং তার পূর্ব স্বামীকে স্বর্ণ দিয়ে বিদায় করেন। দাঁড়িপাল্লার এক দিকে মারিয়া ইমহোফকে বসিয়ে আর অন্য পাল্লায় স্বর্ণ রেখে এই ওজন নির্ধারিত হয়েছিল। মারিয়া ইমহোফ এর চিত্র শিল্পী জার্মান স্বামী তার প্রিয়তমা স্ত্রী'কে ফেরত পাবার দুঃসাহস দেখাননি। কারণ ভারতের দোর্দন্ড প্রতাপশালী গভর্ণর জেনারেল বলে কথা। (তথ্যসূত্র ঃ বিলিভ ইট অর নট। ভবেশ রায় সম্পাদিত ও ঢাকা'র অনুপম প্রকাশনী প্রকাশিত পৃষ্ঠা-২৫২")।

ঔপনিবেশিক সরকারের বিভিন্ন স্বল্পস্থায়ী ল-রেগুলেশনস এর মাধ্যমে বৃটিশদের প্রথম যুগের বিচার কাজ ও প্রশাসনিক কর্মকান্ড চলতো। ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী'র আমলে ১৭৯৯ সালের ৭নং রেগুলেশন (ইতিহাসে কুখ্যাত হাফতম আইন) মতে জমির খাজনা অনাদায়ে ঔপনিবেশিক সরকারের অনুগত মধ্যস্বত্ব ভোগী জমিদারগণ প্রজাকে কাচারীতে ধরে নিয়ে মারধর, হাত-পা বেঁধে অন্ধ কুঠুরিতে ফেলে রাখা, প্রজার স্ত্রী কন্যাকে বন্ধক হিসেবে আটক রাখা, বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করা এবং ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করা ছিল আইনগতভাবে বৈধ ও নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। আদালতের কোথাও এর বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়া যেতনা ।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হবার আগে পর্যন্ত প্রায় এক শতাব্দীকাল যাবত হাফতম, সূর্যাস্ত আইন , চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ নানা ধরণের মানবতা বিরোধী উদ্ভট আইন দিয়ে ঔপনিবেশিক বৃটিশরা এদেশে এক বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। এ রকম নানা পরিবর্তন ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সময়ের বিবর্তনের ধারায় এসকল আইন বৃটিশ দখলাধীন ভারতের অংশ হিসেবে আমাদের দেশেও চালু থাকে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা মহারানী ভিক্টোরিয়া নিজের হাতে নেবার পরবর্তী সময়ে আইন ব্যবস্থা মোটামুটি স্থিতি পায়। ১৯৪৭ সালে বৃটিশরা চলে যাবার পর পাকিস্তানে এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানীরা বিতাড়িত হবার পর বৃটিশ পাকিস্তানীদের সেই ঔপনিবেশিক সিষ্টেমটিই স্বাধীন বাংলাদেশে চালু রাখা হয়। তাই আজো আমাদের সব মৌলিক আইনগুলো হচ্ছে সেই বৃটিশ আমলের। প্রকাশ্যে বৃটিশদের প্রণীত সে সব আইনের এই মর্মে একটি প্রচারণা ছিল যে, 'রাজা কখনো অন্যায় করে না এবং রাজার পক্ষে নিযুক্ত বিচারক বা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরাও কোন অন্যায় করে না।' কিন্তু নেপথ্যে মূল উদ্দেশ্যটি ছিল দমন-পীড়ন চালিয়ে এদেশে অস্থিতিশীল সমাজ কায়েম করে শোষণের নিরাপদ ক্ষেত্র অব্যাহত রাখা। কারণ

www.pathagar.com

অস্থিতিশীল সমাজেই শোষণ চলে সুবিধাজনক ভাবে। এদেশে ১৯০ বছরকাল রাজত্বকালে বৃটিশরা সফলতার সাথেই সে উদ্দেশ্য পূরণ করেছে।

বৃটিশ-পাকিস্তানী আমল ও আজকের আমলে পার্থক্য হলো, এসব মানবাধিকার বিরোধী আইন কানুন ব্যবহার করে শোষণলব্ধ সম্পদ দিয়ে বৃটিশ ও পাকিস্তানীরা তাদের স্বদেশকে সমৃদ্ধ করেছে; আর বাংলাদেশে সমৃদ্ধ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু লোক, তাদের হাতে সম্পদের পাহাড় জমে উঠেছে। বৃটিশ আমলের সেই অবৈজ্ঞানিক অসাধুতার স্থান দখল করেছে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগের বিজ্ঞানসম্মত অসাধুতা। এর অনুশীলনের পরিনতি হচ্ছে বাংলাদেশের দুর্ভাগ্যের কারণ। ফলে আজ সাধারণ মানুষ দরিদ্রতা থেকে ক্রমশঃ ছিন্ন মূলে পরিণত হচ্ছে। আইন ও বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় আজ রেল ষ্টেশন, বড় বাসস্ট্যান্ড, বাজার, লঞ্চ টার্মিনাল, হাট-গঞ্জ, বস্তি, কোর্ট প্রাঙ্গণ, শহর, ফুটপাত ক্রমশ ভরে উঠেছে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, আশ্রয়হীন, বেকার, ক্ষুধার্ত নর-নারী ও শিশুতে। মানবাধিকার এদেশে ধূলায় লুটোপুটি খায়। এদেশ ও জনগণের সামনে এখন কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বা লক্ষ্য নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থার এই অসাম্যের বিরুদ্ধে চিরবিদ্রোহী যুবসমাজের যে ক্রোধ তাই প্রশমিত হচ্ছে তাদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দ্বারা। একের পর এক নতুন আইন বলবৎ করে দেশকে আইনের জঙ্গলে পরিণত করা সত্ত্বেও এসব সন্ত্রাস বন্ধ করা যাচ্ছে না।

আদালতের বিচার ব্যবস্থার সাথে আইনী প্রক্রিয়া ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় প্রাসঙ্গিকভাবেই এদেশে প্রচলিত এবং সংশ্লিষ্ট কিছু আইনের বিষয় এ নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক বৃটিশদের বৈষম্যমূলক আইন ব্যবস্থায় ক্ষমতাবানদের পক্ষে আইনের সুবিধামতো প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রাখা হয়েছে যা আইনের ফাঁক ফোকর নামে সুপরিচিত। প্রচলিত বৃটিশ সনাতনী আইনগুলোর অপপ্রয়োগকে আইনগত বৈধতা দিতে আইনের ভাষ্যে "সরল বিশ্বাসে" এবং "যুক্তিসঙ্গত" শব্দ দুটিকে অত্যন্ত নগ্ন ও চাতুর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে; যাতে করে এসব আইনের অপপ্রয়োগকারী সরকারী কর্মকর্তা আইনের শাস্তির উর্ধ্বে বিবেচিত হন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারা (উপধারা: প্রথমত) এবং দণ্ডবিধি আইনের ৭৭ ধারার উল্লেখ করা যায়। ৫৪ ধারায় বলা হয়েছে, " কোন পুলিশ অফিসার আদালতের অনুমতি ছাড়াই এমন যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন, যিনি কোন অজ্ঞাত অপরাধের সাথে জড়িত বলে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ সৃষ্টি হয়" এবং দণ্ডবিধির ৭৭ ধারায় বলা হয়েছে– "বিচারক এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে বিচারকাজ করলেও যদি তা সরল বিশ্বাসে করা হয়, তাহলে তা কোন অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবেনা।" এ কালো আইন দুটো দিয়ে সন্মানিত বিচারকগণকে

www.pathagar.com

বানানো হয়েছে অসীম ক্ষমতাবান জল্লাদ আর পুলিশকে বেপরোয়া ক্ষমতা দিয়ে বানানো হয়েছে বলপ্রয়োগের লাঠিয়াল।

দন্ডবিধির ৭৭ নং ধারার ক্ষমতাবলে বিচারক সরল বিশ্বাসে মামলার নিরপরাধ আসামীকেও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে পারেন! এজন্য বিচারককে কোথাও জবাবদিহী করতে হবে না । আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা "সরল বিশ্বাস" শব্দটি তাঁকে রক্ষা করবে ! তাহলে জল্লাদের সাথে বিচারকের পার্থক্য থাকে কোথায় ? তবে দন্ডবিধি আইনের "৫২ নং ধারায় বলা হয়েছে,- "যথাবিহিত সতর্কতা ও মনোযাগ ছাড়া কিছু করা হলে বা বিশ্বাস করা হলে তা "সরল বিশ্বাসে" করা হয়েছে বা বিশ্বাস করা হয়েছে বলে বিবেচনা করা হবেনা।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে এই ধারায় সরল বিশ্বাসে শব্দটির একটি নেতিবাচক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। শব্দটির মধ্যে অন্ত র্নিহিত নৈতিক সততা বা সৎ অভিপ্রায়ের কোন স্পষ্ট উল্লেখ সংজ্ঞাটির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়না।" (সূত্রঃ- এস.এস.বক্স প্রণীত এবং ১৯৭৪ সালে ঢাকার মল্লিক ব্রাদার্স প্রকাশিত- দন্ডবিধি আইন সহায়িকা ,পৃষ্ঠা নং -৫২)

চলমান বিচার সংস্কৃতিতে 'সরল বিশ্বাসে' শব্দটির কয়েকটি মতলবি ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গত কাঠুরের গল্পটি উল্লেখ্য। আমাদের আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক পন্ডিতগণ ঔপনিবেশিক আমলের সেই খোঁড়া যুক্তি আজও মেনে চলেছেন যে "গাছ কাটার সময় কাঠুরের হাত থেকে অসাবধানতায় ফস্কে যাওয়া কুড়ালের আঘাতে পাশে দন্ডায়মান ব্যক্তি নিহত হলে তা কাঠুরের সরল বিশ্বাসে কৃত অপরাধ হিসেবে গন্য করা হবে।" এই তথাকথিত অকাট্য যুক্তিটি হচ্ছে "সরল বিশ্বাসে" শব্দটির ধুরন্ধর ব্যাখ্যা যা আজকের জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে সর্বক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য নয় । কারন আধুনিক যুগের একজন সুশিক্ষিত, সচেতন ও "বিজ্ঞ বিচারকের হাতে থাকা কলমের" সাথে দেড়'শ বছর আগের গল্পের একজন নিরক্ষর, স্বল্প সাক্ষর বা "অসচেতন কাঠুরের হাতে থাকা কুড়ালের" তুলনা বড়ই বেমানান, অবাস্তব ও অগ্রহনযোগ্য । অন্যদিকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ নং ধারার ক্ষমতা বলে পুলিশ অফিসার নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতাবান ভাবতে পারেন । তিনি কল্পনায় যে কোন নাগরিককে কোন অজ্ঞাত অপরাধের সাথে জড়িত বলে চিন্তা করতে পারেন। অতঃপর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই মনগড়া অভিযোগে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা "যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ" এর মাড়াইকলে ফেলে তাকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেন । ৫৪ ধারার বড়শী'তে গেঁথে যাওয়া ভুক্তভোগী অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ ও অর্থনাশ করে অনির্দিষ্ট সময় পর মুক্তি পান অথবা মাসের পর মাস হাজতবন্দী থাকেন। এতে একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করা হলো কিনা তা পুলিশের বিবেচ্য বিষয় নয়। এজন্য পুলিশ অফিসারকে কোথাও জবাবদিহি করতে হবে না । আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা "যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ" তাকে

www.pathagar.com

রক্ষা করবে। সংশ্লিষ্ট আইন বইতে এই যুক্তি সংগত সন্দেহের কোন যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমন ভয়ংকর ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এমন কি প্রধান বিচারপতিরও নেই ।

১৮৯৮ সাল থেকে কত লক্ষ-কোটি নিরপরাধ মানুষ এ আইনে পর্যুদস্ত হয়েছেন তার পরিসংখ্যান কোন কালেই পাওয়া যাবেনা । ৫৪ ধারায় পুলিশকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ও দূর্নীতিতে উৎসাহিত করার ফলে বহু চেষ্টা সত্বেও গত এক শতাব্দীতে কখনও পুলিশকে জনগণের বন্ধু বানানো যায়নি। বস্তুতঃ বিদ্যমান ঔপনিবেশিক আইনী ব্যবস্থায় "যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ" এবং " সরল বিশ্বাস" শব্দ দুটির সর্বসম্মত মানদন্ড নির্ণীত না থাকায় তা ক্ষমতা অপব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে প্রয়োগের শংকা বিদ্যমান থেকেই যাচ্ছে। কুশলী ভাষা বিন্যাসে আইনের শাসনের নামে সততার মুখোশ পরানো এসব কালো আইন প্রণীত হয়েছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাজশক্তি'র প্রশ্নাতীত আনুগত্যের বিনিময়ে এদেশীয় সরকারী কর্মকর্তাদের পুরস্কৃত করতে। আজ সেই ঔপনিবেশিক প্রভূরা নেই বটে; তবে আইনী আচ্ছাদনে তাদের অপরাধ বৃত্তির ধারাটি আজো স্বাধীন দেশে বহাল তবিয়তেই অক্ষত রয়েছে।

পাশাপাশি একজন সাধারণ নাগরিককে একটি আইন যখন সুবিচারের নিশ্চয়তা দেয় অন্য আইন তখন সেই অধিকারের নিশ্চয়তাকে নানা জটিল শর্ত যুক্ত করে দিয়ে কন্টকাকীর্ণ করে ফেলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯০৯ সালের তামাদী (Limitation actt) আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। এই আইনে ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্নভাবে শর্তযুক্ত করে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে মানুষের বৈধ অধিকার হরণ করা হয়। আইনটির স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে,- মানুষের মধ্যে অনন্তকাল ধরে চলা পারস্পরিক কলহ বিবাদ অবসান ও মামলা মোকাদ্দমা নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এ আইন প্রনীত হয়েছিল। অকাট্য সাধু যুক্তি বটে ? অথচ একটা মামলা কতদিনে সমাপ্ত হবে তার কোন মেয়াদ কোন বৃটিশ আইনের কোথাও উল্লেখ নেই। মামলার সমাপ্তিকাল বিচারকের খেয়াল খুশী নির্ভর হবার কারণে চার স্তর বিশিষ্ট আদালতের দুরূহ আপিল প্রক্রিয়া পাড়ি দিয়ে বৈধ স্বত্ব (ব্যক্তি'র বৈধ অধিকার) আদালতে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে একজন মানুষের কচ্ছপের আয়ুর প্রয়োজন। কারণ এসব মামলা ২০ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত আদালতে চলার বহু নজির রয়েছে। ফলে বাদী, বিবাদী, উকিল, সাক্ষী এমনকি আদালতের বিচারক মারা যাবার পরেও বংশ পরম্পরায় মামলা চলতে থাকায় মামলার খরচ যোগাতে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো ধ্বংস হয়ে যায় আদালতের রায় পাবার আগেই। অন্যদিকে স্বত্ব মামলা দায়ের করার আগে মোট সম্পত্তির মূল্যের উপর পূর্ব নির্ধারিত টাকার কোর্ট ফি (সরকারী ট্যাক্স) খরিদ না করলে আদালতে মামলা চলবেনা। এই কোর্ট ফি'র টাকা যোগাড় করতে স্ত্রী-কন্যার

www.pathagar.com

স্বর্নের হার, কানের দুল বা হালের বলদ বিক্রী করতে হবে কিনা তা আমাদের আইন- আদালতের বিবেচ্য বিষয় নয়। অবশ্য আইওয়াশ করতে পপারস্যুট নামের মামলার বিধান রয়েছে, যেখানে নিঃস্ব মানুষের কোর্ট ফি কিনতে হয় না। কিন্তু আদালতে নিঃস্ব প্রমাণে আইনের বিভিন্ন শর্ত পূরণ করতে এক যুগ পার হয়ে যেতে পারে; মূল মামলা দায়ের করা পরের কথা। এসব আইনী জটিলতার ফলে ক্ষমতাবানরা সহজেই গরীবের সম্পদ গ্রাস করতে পারে। প্রতিষ্ঠা পায় অপরাধ। এতো গেল দেওয়ানী আইন ব্যবস্থা। ফৌজদারী আইনে মিথ্যা অভিযোগে একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে বছরের পর বছর কারাবন্দী রেখে তার পরিবারকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে শত্রুতা উদ্ধারের এমন নিরাপদ সুযোগ সম্ভবতঃ বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও নেই। কার্যকর জবাবদিহির ব্যবস্থা না থাকায় বিশেষ করে পুলিশ এই সুযোগটি অহরহ ব্যবহার করে অবৈধ উপার্জনের জন্য। বিষয়টি এতোই ওপেন সিক্রেট যে নাগরিক জীবনে এটা অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত।

মিথ্যা মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এদেশে কোন শক্তিশালী আইনী প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই। ক্ষতিপূরণের মামলা করলে আবার সেই কোর্ট ফি খরিদ করে মামলা দায়ের করে বছরের পর বছর ধরে অনির্দিষ্টকাল সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দরিদ্র মানুষের সামর্থ্য না থাকায় এবং পুনরায় নির্যাতিত হবার ভয়ে তারা কেউ মানহানি বা ক্ষতিপূরণ মামলার ধারে কাছেও যান না। কেউ মামলা করতে সক্ষম হলেও আইনের দীর্ঘ জটিল প্রক্রিয়ায় তিনিও এক সময় মামলা চালাতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এভাবে আবারো প্রতিষ্ঠা পায় অপরাধ। এভাবে ছলে বলে কৌশলে এবং আইনের অপব্যবহারের সুযোগে একজন ক্ষমতাবান সহজেই একজন দরিদ্রের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ আত্মসাৎ করে থাকে। এখানে আমাদের অবশ্যই ১৭৫৭ সালের সেই ঐতিহাসিক পলাশী ট্রাজেডির কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, বৃটিশরাও এদেশের ভূসম্পদ গ্রাস করেছিল ছলেবলে কৌশলে এবং তাদের "জোর যার মুল্লুক তার" নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের গোটা ঔপনিবেশিক সিষ্টেম; বাংলাদেশ যার উত্তরাধিকার বহন করছে মাত্র। তাই অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালে প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে হতাহতের যে ঘটনাগুলো দেখা যায় তার একমাত্র কারণ হচ্ছে আমাদের ঔপনিবেশিক সিষ্টেমের ধারাবাহিক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া যা আমাদের সমাজ জীবনের উপর সিন্দাবাদের দৈত্যের মতোই চেপে আছে। বস্তুত একজন দরিদ্র বিচারপ্রার্থীর সামনে সমাধানের সকল পন্থা নিঃশেষ, অন্তহীন প্রতীক্ষা, ভিত্তিহীন প্রত্যাশা আর প্রতিকারহীন সংকটের দোলাচলে বিমূর্ত হয় ন্যায়বিচার।

www.pathagar.com

ইতিহাস ও আইন বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত প্রয়াস ছাড়া সাধারণ মেধার উর্ধ্বে কোন গবেষকের পক্ষে এসব ভয়ানক জটিল আইনের কুল কিনারা করা সম্ভব নয়। এভাবে জরাজীর্ণ আইনী ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা বা সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের বিচারকগণের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হন। তা সত্ত্বেও বিচারকগণের পরিশ্রম, দক্ষতা-সততা, ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, অধ্যাবসায় ও আন্তরিকতার ফলে বিচারাদালতে যতটুকু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হচ্ছে তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

দখলদার বৃটিশদের ১৭৫৭ সাল পরবর্তী স্বেচ্ছাচারী "ল" রেগুলেশনস্‌গুলোর সারনির্যাস এবং ইউরোপীয় আইন শাস্ত্রের অনুকরণে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রতিভূ লর্ড টমাস ব্যারিংটন মেকলের নেতৃত্বে ১৮৩৮ সালে গঠিত আইন কমিশন যখন এসব মানবতা বিরোধী আইনের খসড়া তৈরী করে তখন সেখানে এদেশবাসীর কোন প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এসব আইন প্রবর্তন ও বলবৎ করার সময় তারা এদেশের জনগণের মতামতেরও কোন তোয়াক্কা করেনি। আজ্ঞাবহ বৃটিশ শাসনের সহায়ক শক্তি এই শোষণমূলক আইন ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখেই সাজিয়েছিল তারা তাদের বিচার ব্যবস্থা। তাই আজো আমাদের বিচারব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল, ব্যয়বহুল, সময়বহুল এবং জবাবদিহিতাবিহীন অবস্থায় রয়ে গেছে। এ বিচার প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার শ্রমঘন্টা, মানুষের সুনাম, সম্পত্তি, অর্থ ও জীবনের কিরূপ অপচয় হচ্ছে তা দেখার কেউ নেই। সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিনাদোষে অনির্দিষ্টকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করার পর ক্ষতিপূরণ ছাড়া আদালতের রায়ে বেকসুর মুক্তি পাবার নাম হলো ফৌজদারী বিচার। আর ৫ টাকার সম্পদ উদ্ধারে প্রায় ২০ টাকা খরচ করে অনির্দিষ্টকাল পর আদালতের যে রায় পাওয়া যায় তার নাম দেওয়ানী বিচার। এই বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিভৃতে ক্রন্দন ছাড়া প্রকাশ্যে কোন সমালোচনার নাম হলো আদালত অবমাননা; যা আবার কারাদন্ডযোগ্য অপরাধ।

ঔপনিবেশিক শাসকদের পরাস্ত করে তাদের স্বৈরাচারী এই সিস্টেম থেকে রেহাই পেতে এদেশবাসী শতাব্দীর পর শতাব্দী উদ্ধতভাবে লড়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ আছে আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই বীরত্বগাঁথা। বৃটিশদের বিতাড়িত করতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়, পাকিস্তানীদের বিতাড়িত করতে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং ১৯৯০ সালের স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিপুল অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এদেশের গণমানুষ বারবার চেয়েছে এই শোষণ কাঠামো থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে। তাদের সে আশা পূরণ হয়নি আজো। বৃটিশ শাসকদের মতো আমাদের শাসকগণও এসব

www.pathagar.com

মান্ধাতা আইন দেশবাসীর উপর চাপিয়ে দিতে জনগণের মতামতের কোন তোয়াক্কা করেননি। পরাধীন দেশের শাসন, প্রশাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে বলবৎ করা উচিৎ কিনা সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত দেশবাসীর গণভোট বা মতামত নেয়া হয়নি।

১৯৭২ সালের ২২ মে বাংলাদেশ প্রেসিডেন্টের ৪৮ নং জরুরী আদেশ বলে পাকিস্তান আমলে চালু সব আইন বহাল রাখা হয় এবং আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয় । যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সদ্য স্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে প্রেসিডেন্টের এই জরুরী আদেশ হয়তো যথার্থ ছিল। কিন্তু এরপর স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন প্রণয়নের পদক্ষেপ না নিয়ে পরিশ্রম বিমুখ শাসকগোষ্ঠি সাবেক ঔপনিবেশিক আইন কানুনগুলো এদেশে চালু করার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ সংবিধানে ১৫২(১) অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করে। প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যায় সংবিধানের ১৫২(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রচলিত আইন: অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশ বিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক এমন যে কোন আইন।"

বস্তুত এটি ছিল আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দুস্কৃতিমূলক ঘটনা যা আগামী প্রজন্মের ইতিহাসবিদদের গবেষণার অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে থাকবে। আরো বিস্ময়ের ঘটনা হচ্ছে, শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের দরিদ্রতার জন্য একদিকে বৃটিশ-পাকিস্তানীদের ঔপনিবেশিক শোষণকে দায়ী করছে; অন্যদিকে সেই ঔপনিবেশিক শোষণ কাঠামোটির শোষণ ক্রিয়া অব্যাহত রেখে জনগণকে বলছে এটাই আইনের শাসন আর এর নামই প্রকৃত স্বাধীনতা ? জনগণের সাথে শাসক শ্রেণীর এই নিষ্ঠুর তামাশার যেন আর শেষ নেই। যে দেশের উর্বর মাটিতে বীজ ফেললেই ফসল, আছে তেল ও গ্যাসের মতো মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ; যে পরিশ্রমী জাতি যন্ত্রের প্রয়োজন মেটায় সবল হাত দিয়ে ,সেই সম্ভাবনাময় বাংলাদেশীদেরকে অলস জাতি আখ্যা দিয়ে এই ঔপনিবেশিক কাঠামোতে আবদ্ধ রাখার নির্মম তামাশাকে ঘৃনা করার যথার্থ শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। উল্লেখিত মতে, সাংবিধানিক মোড়কে ঔপনিবেশিক আইনগুলো অদ্যাবধি কার্যকর থাকার ফলে গত শতাব্দীতেই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটছে যখন মানুষ এবং একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গবেষণা উৎপাদন ও উন্নয়নের চরম উৎকর্ষের যুগে এসেও আমরা শাসিত শোষিত হচ্ছি সেই ১৮শ ও ১৯'শ শতাব্দীর জরাজীর্ণ অচল আইন ও বিচার ব্যবস্থায় । ১৮/১৯ শতকের বর্বর সিস্টেমে বন্দী থাকায় বাংলাদেশের একজন মানুষও আজো বিশ্বাস করে না যে এদেশ কোন দিন উন্নত বিশ্বের সমকক্ষ হতে পারে একটানা আড়াই'শ বছরের দুঃশাসন মানুষের আত্মবিশ্বাসকেও এভাবে

www.pathagar.com

ধ্বংস করে দিয়েছে। উন্নত বিশ্ব থেকে আমাদের অন্তত দু'শো বছর পিছিয়ে থাকার গোপন রহস্য এখানেই।

অন্যদিকে যৎসামান্য সংশোধনের পর একই ঔপনিবেশিক আইন কানুনগুলোর অধীনে পাকিস্তান ও ভারতের বিচার ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরেও দক্ষিণ এশিয়ার সে দুটি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দরিদ্রতাকে আজো পরাভূত করতে পারেনি। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক কাঠামো দৃষ্টে হতবাক ভারতের আশাহত বৃহত্তর সমাজে আওয়াজ ওঠেছিল,- 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়, লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়' অর্থাৎ এই স্বাধীনতা মিথ্যা, লাখ-লাখ মানুষ ক্ষুধার্ত। গত অর্ধশতাব্দী ধরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিচার বঞ্চনাজনিত হতাশার ক্রোধ'কে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পাকিস্তান ও ভারতের কর্ণধারগণ ধর্মীয় সংঘাত ভিত্তিক রাষ্ট্রচিন্তা, পারস্পরিক বৈরিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, পরমাণু বোমা সহ যুদ্ধাস্ত্রের স্তুপ প্রদর্শনের মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঔপনিবেশিক সিস্টেমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৃহত্তর সমাজের দারিদ্র্যতা যেমন আছে-তেমন রেখে দেয়ার মধ্যে। তাই স্বাধীনতার পর আশাহত বেদনায় সৃষ্ট প্রচন্ড সামাজিক অস্থিরতায় পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে দ্বিখন্ডিত হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙ্গে বেরিয়ে যেতে ৭টি অঙ্গরাজ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম করছে এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো বার বার ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। প্রায়ই বাংলাদেশের সংকটকালীন সময়গুলোকে বাংলাদেশের রাজনীতিকরা বলছেন ক্রান্তিকাল। মানুষের ন্যায্য অধিকার হরণকারী আইন কানুনের উপর নির্ভরশীল ঔপনিবেশিক চরিত্রের সরকার, মধ্যস্বত্বভোগী সামন্ত শ্রেণী ও বৃটিশ সৃষ্ট ভদ্রলোক শ্রেণী- এই ত্রিশক্তি'র স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিহিত রয়েছে বৃহত্তর সমাজের দরিদ্রতা একটা স্থিতবস্থার গন্ডির বৃত্তে আবদ্ধ রাখার মধ্য দিয়ে । ফলে আড়াইশো বছর থেকে এ উপমহাদেশের বৃহত্তর সমাজের দারিদ্র্যতা অপসারণ করা যায়নি কোন মতেই। বৃটিশ সৃষ্ট ভদ্রলোক শ্রেণী সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলাম লিখেছেন-, সব ঔপনিবেশিক শাসনেই এধরনের প্রথানুগত সুবিধাভোগী শ্রেণী থাকে যার প্রধান ভূমিকা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসনের সুফল প্রচার করা, সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা ও প্রকৃত সমস্যাকে আঘাত না করে নানা ধরণের উপরি সংস্কারের আন্দোলন পরিচালনা করা । তাদের প্রচারের ভাষা জনকল্যাণ, শিক্ষা , প্রগতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি শব্দে ভরপুর। ডঃ ইসলাম Macaulay's minute on company's education policy- 1835. এর উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখেছেন ,-তাদেরকে মনে রেখেই লর্ড মেকলে বলেছিলেন - " বৃটিশ শাসন কায়েমের জন্য এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে যা তৈরি করবে একটি খাঁটি ভদ্রলোক শ্রেণী । এই শ্রেনী যদিও রক্তে হবে ভারতীয় কিন্তু রুচি ও সংস্কৃতিতে হবে ইউরোপীয়।"

www.pathagar.com

(সূত্রঃ ঢাকা'র কথা বিচিত্রা প্রকাশিত বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা ও সামাজিক সমস্যা- পৃষ্ঠা নং.৩০)

'বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা ও মানবাধিকার' বইয়ের এর মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে দেশের মান্ধাতা পদ্ধতির বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত। তবে এ সীমাবদ্ধ পরিসরে মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঔপনিবেশিক আইনগুলোর দোষগুণের বিস্তারিত বর্ণনা ও অনুপুংখ বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। তবে এ নিবন্ধগুলো উপস্থাপনার প্রয়োজনে সহায়ক আইনগুলো সাধ্যমত বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আদালত সৃষ্টির সেই বিশ্বজনীন সুমহান উদ্দেশ্য এদেশে কিভাবে নাস্তানাবুদ হচ্ছে তার সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য তুলে ধরাই হচ্ছে এ নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমাদের বিচারক বা আদালতের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, বিদ্বেষ, অপবাদ বা অবমাননার জন্য নয় বরং বিচার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে ওঠার পথ বাতলে দিতে এ ব্যবস্থার ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে মাত্র। যাতে করে জনগণের নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার এসব দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা অবসানে কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেন। এ লেখাটি তৈরী করতে বাংলাদেশ সংবিধান, প্রচলিত দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি, দেওয়ানী কার্যবিধি, দুর্নীতি নিরোধ আইন, সরকারী কর্মচারী আচরণবিধি, বিচার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের রক্ষা আইন, আদালত অবমাননা আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো ছাড়াও গত ১৭ বছরে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলোর সহায়তা নেয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানা বুঝার জন্য এসব আইন ও সূত্রগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

আইনের শাসনের আয়নায় বাংলাদেশ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় শাসকশ্রেণীর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে আড়াই শতাব্দী কাল যাবত। লর্ড ক্লাইভ-মীরজাফর থেকে শুরু করে ম্যাকলে-মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত সকলেই আইনের শাসনের মাহাত্ম্য গেয়েছেন এদেশের দাসানুদাস প্রজাকুলের সামনে। পররাজ্যগ্রাসী বিদেশীদের তৈরী এই আইনের শাসনের ঝাণ্ডাধারী হলেন ইস্কান্দার মীর্জা-আয়ুব, ইয়াহিয়া থেকে শুরু করে আজকের বাংলাদেশের সেনা/ডাইনেস্টি শাসকগণ। দুইবার স্বাধীনতার দাবীদার চৌকিদার দফাদার থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী সকলে আইনের শাসনের অভয়বাণী শোনাচ্ছেন অবিরত। শাসককুলের ভারবাহী দরিদ্র জনগণকে আইনের শাসনের কুমীরছানা দেখানো হয় বারবার। পদ্ধতিগত শোষণের হাতিয়ার এসব আইন সংস্কারে পর্বতসম রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি মূষিক প্রসব করছে অর্ধশতাব্দীকাল যাবত। স্বাধীনতার আড়াই যুগ পরেও আইনের শাসন কেন বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ হয়নি বা একটা স্থিতিশীল সমাজ উপহার দিতে পারেনি তা অনুসন্ধানে এদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট সংক্ষেপে পত্রস্থ করা হল। সম্মানিত পাঠক এ থেকে খুঁজে নিতে পারেন স্বদেশ ও বিদেশে আইনের শাসনের পার্থক্য এবং বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর কাতারে কোথায় আমাদের অবস্থান?

পুলিশী নির্যাতনে ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনায় দক্ষিণ কোরীয় স্বরাষ্টমন্ত্রীর পদত্যাগ ও প্রেসিডেন্টের প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা। দুই পুলিশ গ্রেফতার। (দৈনিক খবর ২১ জানুয়ারী ১৯৮৭)। 'গাড়ী চালাইয়া যাইবার সময় সাইকেল আরোহীকে আহত করার দায়ে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লাঙ্গকে ট্রাফিক পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে' (ইত্তেফাক, ৪ এপ্রিল ১৯৮৭)। ভারতের লোকসভায় সদস্যরা প্রবীণ এক বিচারপতির বিচারে বসেছেন। তিনি হলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ভি রামাস্বামী। প্রধান বিচারপতি থাকাকালীন সরকারী তহবিল অপব্যবহার করেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ। তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য লোকসভাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে- (বাংলাবাজার ১১ মে, ১৯৯৩)। 'দুর্নীতির অপরাধে চীনে ৩০ জন পুলিশ অফিসারের মৃত্যুদন্ড' (মিল্লাত, ২৫ মার্চ ১৯৯৫)। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট লীতেং ইউ দেশে কয়েকটি অপরাধমূলক ঘটনায় সামাজিক অশান্তি বেড়ে যাওয়ায় প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধ

www.pathagar.com

থেকেই তিনি এই ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, (ইনকিলাব, ১৬ মে ১৯৯৭)। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট চুন দোহোয়ানে প্রধানমন্ত্রী লুসিন ইয়াংসহ ৭ জন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করেছেন। গত জানুয়ারী মাসে পুলিশ হেফাজতে এক ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনা কেন্দ্র করে এ পদচ্যুতি ঘোষণা করা হয়, (ইনকিলাব, ২৭ মে ১৯৮৭) । সিঙ্গাপুরের এক আদালত তান কোক হিওঙ্গ নামে এক ব্যক্তিকে বিড়াল হত্যার দায়ে ছ'সপ্তাহের কারাদণ্ড দিয়েছে, (দৈনিক বাংলা, ২৮ মে ১৯৮৭)। পোষা ইঁদুরকে পানি না দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দেয়ার অপরাধে বৃটেনের একটি আদালত লিস চ্যাপম্যান (২৩) নাম্নী এক মহিলাকে ৮০ পাউন্ড জরিমানা এবং আদালতের ব্যয় বাবদ আরো ৫০ পাউন্ড প্রদান করিবার নির্দেশ দিয়েছে। (ইত্তেফাক, ১২ জুন ১৯৯৩)। নিজের পোষা মাকড়সাকে বেলফাস্টগামী বিমানে নিয়ে যেতে বাধা দেয়ায় উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের 'ইনগ্রিড হ্যানোয়ে' নামে এক মহিলা মাকড়সাটি ইনভেলাপে পুরে তার বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন। বৃটেনের বন্যপ্রাণী কল্যাণ সমিতি প্রাণী নির্যাতনের অভিযোগে মহিলার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে সর্বোচ্চ দু'হাজার পাউন্ড জরিমানা অথবা ৬ মাস কারাভোগ করতে হতে পারে। (আল আমীন, ২৩ মে ১৯৯৭)। ইংল্যান্ডের রাজকুমারী এ্যানির স্বামী ক্যাপ্টেন মার্ক ফিলিপসকে দ্রুত গাড়ী চালানোর অপরাধে ১শ' ২০ পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে- (ইনকিলাব, ২ অক্টোবর ১৯৮৭)। ইতালীর কয়েকজন সৎ নির্ভিক এবং দেশপ্রেমিক ম্যাজিস্ট্রেট নিরপেক্ষভাবে আইনপ্রয়োগ করে সে দেশের মন্ত্রী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী , বড় বড় ব্যবসায়ী এবং দুর্ধর্ষ মাফিয়া চক্রের সন্ত্রাসী ও খুনীদের বহুজনকে কারাগারে আটক করেছেন। দেশপ্রেমিক সৎ পুলিশ ও জনগণ ঐ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা সমর্থন যোগাচ্ছেন। ইতালীর মত দুর্নীতিপরায়ন দেশে এমন অসাধ্য সাধন করায় বিচারকরা সেদেশে বিরোচিত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন যা সমগ্র ইউরোপে আলোড়ন তুলেছে। (দৈনিক জনতা, ১০ মার্চ ১৯৯৩)। ধূমপানের অভ্যাসের কারণে সিঙ্গাপুরে ১৬ বছর বয়স্ক এক তরুণকে ২ বছরের জন্য কিশোর অপরাধ দমন হোমে পাঠানো হয়েছে। নিম্ন আদালতের এই রায় এর বিরুদ্ধে আপিল করা হলে প্রধান বিচারপতি আপিলটি নাকচ করে দেন। সিঙ্গাপুরের আইনে ১৮ বছরের নিচে কোন ব্যক্তির ধূমপান অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, (ইনকিলাব, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)।

www.pathagar.com

আমেরিকায় ভারনোলা লোডার নাম্মী এক মহিলার রোগ নির্ণয়ে ভুল হওয়ায় দু'বছর যাবত তিনি যে মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছেন সে জন্য তাকে ৬ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। এই মহিলা দুবছর যাবত বিশ্বাস করতেন তিনি এইডস রোগে মারা যাচ্ছেন। আসলে তার আগের প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টটি ছিল ভুল যা পরে আদালতে প্রমাণ হয়, (সকালের খবর, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪)। গোটা হল্যান্ড সম্প্রতি থমকে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও কোন গাড়ী ট্রেন , ট্রাম, বাস চলেনি। ক্যাফে বার রেস্টুরেন্টে মুহূর্তের জন্য থেমে গিয়েছিল সকল মিউজিক। বিভিন্ন শহরে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিল সহস্র নারী-পুরুষ । মেইনদার ইয়ালোকে নামের অখ্যাত এক যুবক হত্যার প্রতিবাদেই সমগ্র দেশে এই তোলপাড় । ডাচ জনগোষ্ঠী ঘটনার প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল যেন। প্রধানমন্ত্রী ডিমকক ঘটনাটি ডাচ সমাজের অবক্ষয় উল্লেখ করে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান । ঘটনার প্রতিবাদে জাতীয় দৈনিকগুলো প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। রেডিও-টিভির বিভিন্ন চ্যানেলে চলে আলোচনা ও টক শো। দ্যা হেগ আমস্টার্ডামসহ গোটা দেশে পালিত হয় এক মিনিট মৌনতা। এর আগে দুপুরে স্কুলের ছেলেমেয়েরা সারিবদ্ধভাবে হত্যার প্রতিবাদ জানায়....(জনকণ্ঠ, ৬ অক্টোবর ১৯৯৭)। এক মাসে পর পর বড় ধরনের ট্রেন দূর্ঘটনায় শত শত যাত্রী নিহত হবার পর প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমদ বলেন, দুর্ঘটনা ঘটলেই পদত্যাগ করতে হবে-এমন কোন বাধ্য-বাধকতা নেই (ইনকিলাব, ৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯)। মেয়র হানিফ দু'বার ঘোষণা দিয়েছেন যে, ২৮ মার্চের মধ্যে রাজধানী ঢাকাকে তিলোত্তমা করতে না পারলে পদত্যাগ করবেন। আজ ২৫ মে। রাজধানী তিলোত্তমা হওয়ার চিহ্ন নেই। মেয়র আছেন বহালতবিয়তে, ২২ অক্টোবর, '৯৬। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন ছয় মাসের মধ্যে দেশে সন্ত্রাস ও সড়ক দুর্ঘটনা বন্ধ করতে না পারলে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু ৬ মাস পরেও হত্যাকান্ড, সন্ত্রাস ও সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। মন্ত্রী পদত্যাগ করেননি। স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সংবিধানে বঙ্গবন্ধুকে জাতির পিতা প্রমাণ করতে না পারলে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছিলেন । তিনি প্রমাণও করতে পারেননি পদত্যাগও করেননি। (দৈনিক দিনকাল, ২৫মে ১৯৯৭)।

www.pathagar.com

আমাদের বিচার ব্যবস্থার খন্ডচিত্র

১৯৯২ সালের ২৬ মে দৈনিক মিল্লাতের আন্তর্জাতিক পাতায় কৌতূহলোদ্দীপক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যা নিম্নরূপ, "সিডনি থেকে রয়টার জানায়, ১৯৮০ সালে লিনডি চেম্বারলিন নামের এক মহিলাকে তার শিশুকন্যা হত্যার অভিযোগে অষ্ট্রেলীয় একটি আদালত ভুলবশত ৩ বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। কারাদন্ডপ্রাপ্ত এই মহিলা আদালতের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করে ৩৮ লাখ ডলারের ক্ষতিপূরণ আদায় করেছেন।"

উন্নত দেশে এমন ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হলেও বাংলাদেশের মানুষের কাছে তা অলীক স্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা নাম দিয়ে বৃটিশ ও পাকিস্তানীদের ঔপনিবেশিক ধাঁচের বিচারব্যবস্থা আমাদের দেশে কেমনভাবে চলছে তা প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এ নিয়ে সংবাদপত্রের সাথে বিচার বিভাগের দ্বন্দ্ব প্রায়ই লেগে থাকে। ফলে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধেই আদালত অবমাননা মামলাগুলো দায়ের হয় সবচেয়ে বেশী। প্রায় সব ক্ষেত্রেই সংবাদপত্র আদালতে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পেতে বাধ্য হয়। সাম্প্রতিক ক্যাসেট কেলেংকারি মামলাটি ছিল এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত রূপ। আমাদের বিচার বিভাগ হয়তো পছন্দ করছে না যে তাদের এই দেড় শতাব্দীর সনাতন বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাক। তবে আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সবচেয়ে বাস্তব সত্যটি বলেছিলেন সাবেক আইন ও বিচার মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ। তিনি বলেছেন ,- আইনের চোখে সবাই সমান এটা নীতি কথা। দু'জন গরীব লোক মামলায় জড়ালে দু'জনই ধ্বংস হয়ে যায়। মামলায় জড়িতদের একজন গরীব অন্যজন ধনী হলে গরীব মানুষটি হয় নিঃশেষ। আর মামলাবাজ দু'জনই যদি ধনী হয়, তবে ধ্বংস হয় আইন। (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম,৬ ডিসেম্বর ১৯৯১) যা হোক বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে পত্রস্থ করা হলো।

১৬ বছর আগে নিহত বলে কথিত তারি বড়ুয়াকে অবশেষে ফেনী পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অথচ তাকে হত্যার দায়ে মামলার রায়ে চট্টগ্রামের দায়রা জজ আদালত ৪ ব্যক্তিকে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড দেয়। হাইকোর্টে আপিল হলে এ রায় বহাল থাকে। চার আসামী জেল খেটেছে (মিল্লাত, ১৪ এপ্রিল ১৯৯২), ১৯৬৫ সালের একটি মামলা আজো চলছে। ইতিমধ্যে দু'জন বিচারকের মৃত্যু হয়েছে। এ অবস্থায় বিচারের প্রতি জনগণের আস্থা থাকে কি

www.pathagar.com

করে? (ইনকিলাব, ১৯ আগষ্ট ১৯৯০), হাইকোর্ট ছুটি থাকে ৬ মাস। ঝুলে আছে লক্ষাধিক মামলা। এসব মামলার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর পড়ে আছে এমন মামলাও আছে (যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০০০), ৯২ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ আজিজুর রহমান ২৩ বছর ধরে ঘুরছেন একটি মামলার পেছনে। প্রাইজবন্ডের ৫০ হাজার টাকা পেতে এ মামলায় খরচ করেছেন ২ লাখেরও বেশী টাকা। মামলার ৩ উকিল, ১ মুহুরী ও দুই সাক্ষী ইতিমধ্যে মারা গেছেন (যুগান্তর, ৬ ডিসেম্বর ২০০০), দীর্ঘ ১৪ বছরেও পাবনা দায়রা জজ আদালতে বিচারাধীন চাটমোহরের চাঞ্চল্যকর ১২ হত্যা মামলার কুল কিনারা হয়নি। এই সময়ের মধ্যে হাজতে ১ জন, পলাতক অবস্থায় ১ জন এবং জামিনে এসে ৩ জন আসামী মারা গেলেও মামলাটির নিষ্পত্তি হয়নি। এদিকে এই হত্যাকান্ডের জের ধরে আরো ১০টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ায় এই এলাকায় খুনের সংখ্যা ২২ জনে দাঁড়িয়েছে। (জনকণ্ঠ-১৫ সেপ্টেম্বর ২০০২) বিনা বিচারে জেলে কাটিল মমিনের ২০টি বছর (ইত্তেফাক, ১ জুন ১৯৯৭)। পাঁচ বছর আগে খালাস পেয়েও ফজল খাঁ জেলেই আছেন (দৈনিক বাংলা, ২৯ অক্টোবর ১৯৮৫)। বিনা বিচারে জেলেই কেটেছে হানিফের ১২টি বছর (বাংলাবাজার, ২৯ আগষ্ট ১৯৯৪)। ১৫ বছর ধরে বিচারের আশায় ঘুরছেন শেখ আব্দুল জাব্বার। একটা জীবন তার কেটে গেছে পথে বিপথে ঘুরে। প্রশ্ন জাগে এই দেশে আইন কোথায় বাস করে। কোথায় সুবিচার পাওয়ার ঠিকানা? (ইত্তেফাক, উপ-সম্পাদকীয় ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬)। বিনা বিচারে ২২ বছর কারাবাসের পর অবশেষে ফালু মিয়ার জামিন লাভ (ইত্তেফাক, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩)। বিনা বিচারে ১৪ বছর জেল খেটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মুক্তি পেয়েছেন ১০৩ বছর বয়সের বৃদ্ধ হাতেম আলী (ইত্তেফাক, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩)। সংসদের ৫ বছর মেয়াদ শেষ হলেও নির্বাচনী বিরোধের মামলাগুলো শেষ হয়নি। ফলে ভোটের মামলাগুলোর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে ১৭টি এবং হাইকোর্টে এ সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলা অযথা ঝুলে আছে (যুগান্তর, ১৭ জুলাই, ২০০১)।

বিনা বিচারে দীর্ঘ ৯ বছরাধিক কাল থেকে জেলে আটক রয়েছে মোহাম্মদ হারুন ওরফে শফি। এ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী প্রমান পাওয়া যায়নি। আদালত তাকে জামিনে মুক্তি'র নির্দেশ দেয়া সত্বেও তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি (সংগ্রাম-১২ অক্টোবর, ১৯৮৬)। সাজাপ্রাপ্ত আসামী শ্যামল হাইকোর্ট হইতে বেকসুর খালাস পাওয়ার পরেও ৫০ মাস বিনা কারণে কারাভোগ করিয়াছে (ইত্তেফাক, ২৫ জুলাই ১৯৯৯)। আদালতের রায়ে খালাসপ্রাপ্ত জালাল উদ্দিন ৪ বছর ধরে জেল হাজতে (ইনকিলাব, ১২ জুন, ১৯৮৮)। গৌরাঙ্গ পাল

www.pathagar.com

১২ বছর ধরে বিনা বিচারে জেল হাজতে আছে। তার মামলার নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঘটনাচক্রে মুক্তি না পেলে তাকে আর কত যুগ আটক থাকতে হবে তা সে নিজেই জানে না (ইনকিলাব, ১ মে, ১৯৮৮)। চেরাগ আলী ৭ বছর যাবত বিনা বিচারে কারা ভোগ করিতেছে (ইত্তেফাক, ৬ মার্চ, ১৯৯৩)। আদালতে নির্দোষ প্রমাণ হবার পরেও গত এক দশকের বন্দীদশা থেকে আতিকুর রহমান আজো মুক্তি পায়নি (সংগ্রাম, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯২)। বিনা বিচারে ১৫ বছর কারাগারে সরোয়ার (ভোরের কাগজ, ১১ নভেম্বর ১৯৯৫)। বিনা বিচারে শিশু মিয়ার আট বছর কারাবাসের পর আদালতের বিচারে তাকে তিন মাসের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে । বিষয়টি আইন আদালতের পক্ষে গর্বের বিষয় কিনা তা ভেবে দেখা উচিত (ইত্তেফাক;উপ-সম্পাদকীয়, ১৩ নভেম্বর, ১৯৮৬) এক ভাইয়ের অপরাধে আরেক নিরপরাধ ভাই ৫ বছর ধরে জেল খাটছে (মিল্লাত, ১০ আগষ্ট ১৯৯৪)। তোতা মিয়া ৭ বছর ধরে জেলে। এসময়ের মধ্যে তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ কেউ জানে না। তার মামলার কোন নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। নথি না থাকায় আদালতে তার জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে (সংগ্রাম, ১৪ আগষ্ট, ১৯৯৬)। বিনা বিচারে সুরুজ আলীর নয় বছর হাজত বাস (খবর-১৫মার্চ, ১৯৮৭)। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার ১১ বছরের শিশু নজরুল ইসলামকে ডাকাতি ও হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করা হয়। ১২ বছর জেলে থাকার পর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পূর্ণ অবৈধ, বাতিল এবং আইনগত ক্ষমতাবহির্ভূত ঘোষণা করে হাইকোর্ট তাকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে (যুগান্তর ২৬ জুলাই, ২০০২)। ২১ বছর পর হাইকোর্ট থেকে জামিন পেলেন সুলতান (মিল্লাত, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯৮)। হত্যা মামলাটি ১৮ বছর যাবত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে (ইত্তেফাক, ৩ মার্চ ১৯৯৮)। দক্ষিণাঞ্চলের ৬টি জেলায় ১১ হাজার মামলা ১৫ বছর ধরে বিচারের অপেক্ষায় (বাংলার বাণী; ২৩ এপ্রিল, ১৯৯৬) । ঝালকাঠিতে ২২ বছরেও শেষ হয়নি একটি খুনের মামলা। ইতিমধ্যে ১ আসামী ও ৩ সাক্ষী মারা গেছেন (ভোরের কাগজ, ২মার্চ, ১৯৯১)। গত ২২ বছর মামলা চালিয়েও রাজবাড়ীর তাফসীর আহমেদ মামলার রায় পাননি (সংগ্রাম, ১১ আগষ্ট, ১৯৮৯)। ২১ বছর পর সিরাজ মিয়া আদালতের রায় পেয়েছেন (মিল্লাত, ৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৬)। আদালতের রায় পেলেও বৃদ্ধ মুল্লুকচাঁন জমির দখল পাননি। তিনি আজ ভিক্ষা করে পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করছেন (আল আমীন, ১৩ মে, ১৯৯৩)। কাশিয়ানী উপজেলার সিংগা গ্রামের ১১ একর ৪০ শতাংশ জমি নিয়ে সুদীর্ঘ ৫০ বছর মামলা চলার

www.pathagar.com

পর হাইকোর্টের রায় পেয়েও জলধর মন্ডলের উত্তরাধীকারীগণকে জমির ভোগদখলে বাধা সৃষ্টি চলছে (বাংলার বাণী, ২৩ মে, ১৯৯০)। দীর্ঘ ৩৮ বছর আইন আদালত সর্বত্র লড়ে শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আদালতের রায় পেয়েও নিজের বৈধ সম্পত্তি দখল নিতে পারেননি বৃদ্ধা রোকেয়া খাতুন। বিগত ১১ বছর যাবত সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ উপেক্ষিত হয়ে আসছে (ইনকিলাব, ২৯ জুন ২০০২)। জবরদখলকৃত জমি ফেরত পেতে মুহাম্মদ আলী ১৯৬২ সালে মামলা করে স্বপক্ষে ডিক্রী পান। এরপর জজকোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের রায় পেয়েও জমির দখল পাননি। অবশেষে তিনি মানবতার আদালতে বিচার চাইতে গতকাল আসেন জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে। তিনি বলেন, তরুণ বয়স থেকে আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে আমি আজ কর্মক্লান্ত বৃদ্ধ। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী আর নেই। সন্তানরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে ছিন্নভিন্ন। আদালত আমাকে ভোগান্তি ছাড়া আর কিছুই দেয়নি (সংগ্রাম, ২২ আগষ্ট ১৯৯১)।

এ তালিকা আরো দীর্ঘ করা যায়। এতে কোথায় আছে মানবতা, ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, মানবাধিকার, আদর্শ, গণতন্ত্র, সুবিচার ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার রক্ষাকবচ? এই প্রাণসংহারী পদ্ধতির নামই কি বিচার ব্যবস্থা? এর নাম ন্যায়বিচার হলে অভিধানে অবিচারের অর্থ বদলাতে হবে। নিরন্তর চলে আসা এই জীবন বিনাশী ঘটনায় জড়িত কেউ শাস্তি পায়নি, পাবে না। জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নেই কোথাও। মানবাধিকার ও সংবিধানের অভিভাবক হাইকোর্ট কর্তৃক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুয়োমটো রুল জারী করে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা ছিল দেশবাসীর পরম আকাংখিত। এই অসুস্থ বিচার ব্যবস্থার মাড়াই কলে পড়ে সারাদেশে কতো নিরপরাধ পরিবার প্রতি বছর এভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তা নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে আজ পর্যন্ত কোন গবেষণা বা পরিসংখ্যান তৈরী করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বিচার বিভাগীয় সিষ্টেম লসে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে তা নিরূপণে আদালত অবমাননার ভয়ে আজ পর্যন্ত উদ্যোগ নেয়নি কেউ। ফলে সামাজিক ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়েছে সেই কবে থেকে। বাংলাদেশকে মানবতার বধ্যভূমিতে পরিণত করা এ লোমহর্ষক বিচার ব্যবস্থা যদি জাপান, আমেরিকার মতো দেশে চালু করা হয় তাহলে তাদের শক্তিশালী আর্থসামাজিক কাঠামো লন্ডভন্ড হয়ে দরিদ্র বাংলাদেশের সমকক্ষ হতে তাদের ২৫/৩০ দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয়। বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখিত ঘটনাগুলো ৮৫% মুসলমানের বাংলাদেশে ইসলামের বিধি বিধান এবং দেশে প্রচলিত দন্ডবিধি আইনের ৩৪৪ ধারা, সংবিধানের ৩১, ৩২, ৩৩(২), ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচালনার

www.pathagar.com

মূলনীতি ১১ অনুচ্ছেদের গুরুতর লংঘন। এছাড়া এসব মানবসভ্যতা বিরোধী ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৩,৫,৯ এবং ১৭খ ধারার চরম বরখেলাপ। পবিত্র কুরআনে বিচারকদের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে ,- "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে নির্দেশ দিতেছেন, আমানত উহার হকদারকে প্রত্যার্পন করতে । তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করিবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করিবে। আল্লাহ তোমাদিগকে যে উপদেশ দেন তাহা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বশ্রেষ্ঠ । ন্যায় বিচার হচ্ছে একটি আমানত, যার হকদার হচ্ছে বিচার প্রার্থীগণ, আর এখানে আমানতদার হচ্ছেন বিচারকগণ।" (সূত্রঃ সূরা নিসা, আয়াত -৫৮) অন্যদিকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে।" তাছাড়া ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।" ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।" ৩৩(২) অনুচ্ছেদ মতে, "গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদাতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না" এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ মতে, "কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দন্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।" পাশাপাশি ১৮৬০ সালের প্রচলিত দন্ডবিধি আইনের ৩৪৪ ধারায় বলা হয়েছে, "কোন ব্যক্তিকে দশ বা ততোধিক দিনের জন্য অন্যায়ভাবে আটক রাখা হলে অপরাধী ব্যক্তি তিন বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।" দেখা গেছে ১'শ ৪২ বছর বয়সের ভারে ন্যুজ এই দন্ডবিধির ৩৪৪ ধারাটি ফালু মিয়াকে ২২ বছর অন্যায়ভাবে আটক করে রাখার পরেও (সূত্রঃ ইত্তেফাক ১৫ নভেম্বর ১৯৯৩) মূল অপরাধীদের স্পর্শ করতে পারেনি। সংবিধানের ১১, ৩১, ৩২, ৩৩(২), ৩৫(৫) অনুচ্ছেদগুলোও এক্ষেত্রে কোন কার্যকর প্রতিকার করেনি। উল্লেখ্য, বিনাবিচারে ২২ বছর কারাবাসের পরে মুক্তি পাবার কিছুদিন পর ফালু

www.pathagar.com

মিয়া মারা গেছেন। আমাদের দেশের গণতন্ত্রের মহড়ার অগোচরে এভাবে অসংখ্য নিরপরাধ ফালু মিয়া যুগের পর যুগ ধরে রাষ্ট্রীয় লাঞ্ছনা ভোগ শেষে প্রাণ হারাচ্ছেন। গণতন্ত্র, রাজনীতি, সরকার, সংবিধান ও আইন আদালত শুধু নিরব দর্শকের মতো দেখছে ফালু মিয়াদের স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম, সম্পত্তি ও জীবনহানির ভয়ংকর ঘটনাগুলো। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেকরই জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তি নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। ৫নং ধারায় বলা হয়েছে, কাউকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তিভোগে বাধ্য করা চলবে না। ৯নং ধারায় বলা হয়েছে, কাউকে খেয়ালখুশী মত গ্রেপ্তার আটক অথবা নির্বাসন করা চলবে না এবং ১৭ (খ) ধারায় বলা হয়েছে, কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে খেয়ালখুশী মত বঞ্চিত করা যাবে না। পবিত্র ইসলামের বিধি বিধান, বাংলাদেশ সংবিধান এবং এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের অঙ্গীকারগুলো আমাদের বিচার প্রক্রিয়ায় মান্য করা হয় কিনা তা উল্লেখিত সংবাদ শিরোনামগুলোই এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এমন একটা দুটো হলে তা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যেতো। কিন্তু নাগরিক জীবনের উপর যুগের পর যুগ ধরে এই ভয়ানক অবিচার চলছে এবং বাধাহীনগতিতে ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এর নাম কি সভ্য দেশের বিচারব্যবস্থা? এর পরেও কি আমরা নিজেদেরকে সভ্যদেশের নাগরিক বলে দাবী করতে পারি?

আমাদের বিদ্যমান বিচারব্যবস্থা শুধু বিজ্ঞান বিরোধীই নয় জীবন বিরোধীও বটে। রাষ্ট্রের উন্নয়নবিরুদ্ধ এই নির্মম ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে দেশবাসীর প্রাত্যহিক অভাব এতোই ভয়ানক যে তাকে আর নতুন কিছু ভাববার অবসর দেয় না। ফলে এদেশ এক প্রাণহীণ সভ্যতার স্তরে আটকা পড়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কিন্তু একথা বলা ছিল না। ৩১ বছর ধরে এ অস্তিত্ব বিনাশী বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন দেশে কার স্বার্থে কারা কেন বজায় রেখেছে তার বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে সাংবাদিকদের জন্য আরেকটা মহান মুক্তিযুদ্ধ।

www.pathagar.com

বিচারের প্রতি অনাস্থায় অন্ধকার যুগে স্বদেশ

কবি ও দার্শনিক শেখ সাদী বলেছিলেন,-"কোন জাতির বিচারকরা যদি দূর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী (সূত্রঃ দৈনিক সকালের খবর, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯২ইং)। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ জননেতা মার্টিন লুথার কিং বলেছিলেন, "একটি অবিচারও সমগ্র সুবিচারের প্রতি হুমকিস্বরূপ" (সূত্রঃ সাপ্তাহিক দেশবন্ধু, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭), প্রধান বিচারপতি এ টি এম আফজাল বলেছেন,- "বিচার বিভাগের ওপর মানুষের আস্থা হারানোর জন্য বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই দায়ী" (সূত্রঃ দৈনিক সংগ্রাম, ৫ মে, ১৯৯৫) সাবেক তথ্যমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা বলেছেন, "সমাজে আজকে কে না দুর্নীতিপরায়ণ? শুধু ল'ইয়াররা নয়; জজ সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত ঘুষ খায়" (সূত্রঃ দৈনিক মিল্লাত, ১৮ অক্টোবর, ১৯৯১)। আইন মন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ বলেছেন, "অস্বীকার করা যাচ্ছে না বিচারকদের মধ্যেও দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে" (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ২১ আগষ্ট, ২০০২)। "সাবেক প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেছেন,- বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় দুর্নীতি এসেছে,এ নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে হবে। তিনি বলেন,আদালত অবমাননার ভয়ে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে না - এটা ঠিক নয়" (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ১৯ আক্টোবর, ২০০২) বর্তমান প্রধান বিচারপতি মাইনুর রেজা চৌধুরী বলেছেন,-"সংবাদপত্রে বিচারকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দেখে প্রধান বিচারপতি হিসাবে আমাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। তিনি বলেন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্প্রতি তাদের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নিম্ন আদালতকে দূর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিহিত করেছে যা খুবই দুঃখজনক (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক ৩০ ডিসেম্বর ২০০২)"

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন হলেও তার স্পর্শে বিচারব্যবস্থা আক্রান্ত হবে না -এমন আশা ন্যায় প্রত্যাশী সমগ্র জাতির। সেই প্রত্যাশায় ছাই পড়লে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতা, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা, ক্ষোভই যে কেবল বৃদ্ধি পায় তা নয়; সর্বত্র মূল্যবোধহীন একটি ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও গোটা সমাজ অন্যায়ের সেবাদাসে পরিণত হয়। বর্বরতা নৃশংসতা সেই সমাজের নিয়ামক হয়ে পড়ে। সেই সমাজের সমাজ প্রভুদের গডফাদার বলা হয়। সেই সমাজে ১২ হত্যা মামলার আসামী থানায় বসে পুলিশের সামনে সাংবাদিকদের বীর দর্পে বলতে পারে, "মার্ডার কেসের কোন সাজা হয় না, আমারও হবে না, সাজা হলেও বেরিয়ে আসাটা কোন ব্যাপার নয়" (সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন, ২৮ মে ২০০২)। সমাজে ড্রিল মেশিন দিয়ে খুঁচিয়ে, জবাই করে,

www.pathagar.com

টেটাবিদ্ধ করে, পানিতে ডুবিয়ে, ধর্ষণ করে, এসিড নিক্ষেপে, গণপিটুনীতে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে, চোখ তুলে, আগুনে পুড়িয়ে, হাত পা এর রগ কেটে, পানির ট্যাংকিতে ফেলে, রশিতে ঝুলিয়ে, বিষ খাইয়ে, সুয়োরেজ লাইনে ফেলে, পুলিশ হেফাজতে ছাদ থেকে ফেলে এবং শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বারো টুকরা করে জ্যান্ত মানুষ খুন করা হয়। প্রভাতি দৈনিকগুলো প্রতিদিন এসব সচিত্র সংবাদ ছেপে মানুষের চিন্তা চেতনাকে অসাড় করে দিচ্ছে। আভ্যন্তরীন এই বিশৃংখলা জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বকে করেছে বিপন্ন । জাতীয় উদ্দীপনা ভেঙ্গে পড়েছে। একই সাথে হতাশা সর্বত্র। প্রতিকারহীন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ এখন তাৎক্ষনিক হত্যাকান্ডে ভাষা খুঁজে পেয়েছে। সন্ত্রাস আর গণপিটুনির নৃশংসতায় শংকিত জনপদ থর থর কম্পমান। পাশাপাশি আইনী নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতন, হত্যায় আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগের পদধ্বনি সুস্পষ্ট। এ হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের ভয়ংকর চালচিত্র। প্রতিটি রাজনৈতিক সরকার এসব ব্যর্থতার দায় নিজ মাথায় নিয়ে বিদায় নিচ্ছে। দেশের চলমান এসব নৃশংসতা আমাদের বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীনতার চালচিত্র নয় কি? এই আস্থাহীনতা কি আদালত অবমাননার কোন সংজ্ঞায় পড়বে না? বিচারের প্রতি অনাস্থায় চুয়াডাঙ্গায় ইটের ভাটায় জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে ছাই, রাজপথে লুণ্ঠিত নাগরিক, ভার্সিটিতে ধর্ষণের সেঞ্চুরি, বুলেটের তপ্ত সীসায় ঝরে পড়া জীবন, রমনা ভিক্টোরিয়া পার্কে সম্ভ্রম বিক্রি আর হাইকোর্ট মাজারে অভুক্ত সন্তানের সামনে পঙ্গু মা যেভাবে পচে মরছে; আমাদের সমাজ রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা যেন সেই একই পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। স্বাধীনতার ৩১ বছরের মাথায় জনগণের অস্তিত্বে বেজে উঠেছে অন্তিম কান্না। অন্ধকার যুগে আজ বন্দী প্রাণপ্রিয় স্বদেশ। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বিশ্বের দেশে দেশে যুগে যুগে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এরকম অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছে। ফ্রান্স বিপ্লবের পর লুই সম্রাটের অন্ধকার যুগের পতন ঘটিয়ে যুগোপযোগী শাসন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল বিপ্লবী সরকার। তেমনিভাবে রুশ বিপ্লবের পর জার সম্রাটের, চীন বিপ্লবের পর চিয়াং কাইশেকের এবং ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর শাহ্ আমলের সব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থারও পতন হয়েছিল। অথচ বিপ্লবের চাইতেও অধিক রক্তমূল্যে অর্জিত স্বাধীনতার পর শাসক গোষ্ঠী ৩১ বছরেও বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের উপযোগী জননন্দিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয়ায় নির্মম আক্রোশে ইতিহাস কোন কোন শাসককে সপরিবারে নিহত করেছে, কাউকে দীর্ঘ কারাবন্দী রেখে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছে আর শোষিতের আর্তনাদে প্রতিটি সরকার বিদায়ের আগে জণরোষে নিপতিত হচ্ছে আজো সেই ইতিহাসের বাঁধাধরা নিয়মে।

www.pathagar.com

অপরাধীরা যেভাবে আইন আদালতকে পরোয়া করে না

আজ থেকে প্রায় ৩২ বছর আগে ও পরের দুটি মামলার রায়ের প্রামাণ্য দলিলাদি এই লেখকের কাছে সংরক্ষিত আছে যা ক্ষমতাবানদের বেপরোয়া আইন লংঘনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

প্রথম ঘটনার "ক" একজন সরকারী কর্মচারী। তার উর্ধতন কর্তৃপক্ষ "খ" এর আক্রোশে তিনি চাকরিচ্যুত হন। এর বিরুদ্ধে মামলা করে "ক" আদালতে জয়ী হন। চাকরিচ্যুতি আদেশ বে-আইনী ঘোষণা করে "ক" এর চাকরি অবিলম্বে ফেরৎ দিতে আদালত "খ" কে নির্দেশ দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে তামাদী (দেওয়ানী) আইনের বিধান মতে ৩০ দিনের মধ্যে আপিলের সময়সীমা পার হবার ৯ মাস পরেও "খ" আপিল দায়ের করতে ব্যর্থ হওয়ায় রায়টি প্রচলিত আইনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। "ক" কে বঞ্চিত করতে "খ" অতঃপর জনৈক আদালত কর্মচারী "গ" এর যোগসাজশে মূল রায়টি জাল করে তা দিয়ে প্রথম আপিল দায়ের করেন। আপিল আদালতে "ক" লিখিতভাবে এই জালিয়াতির বিবরণ দাখিল করে আপিলটি বাতিলের প্রার্থনা করেন। তামাদী আইনের সুস্পষ্ট নির্ধারণী বিষয় লংঘনের বিরুদ্ধে বিচারকের প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিচারক এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে আপিলটি মঞ্জুর করেন। নিরুপায় "ক" বাঁচার আশায় দরখাস্তে বিস্তারিত জানিয়ে প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলে তার নির্দেশে বিচার বিভাগীয় তদন্তে রায়টি জাল করার অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় "গ" চাকরিচ্যুত হন (সূত্রঃ রেজিষ্ট্রার অব দি হাইকোর্ট জুডিকেটর ঢাকা। নং- ২০৫০-জি, তাং-১৭ এপ্রিল ১৯৭০)। অন্যদিকে ঐ জাল রায়টির উপর ভিত্তি করে "খ" দ্বিতীয় আপিল আদালতের "ক" কে হয়রানিতে ব্যতিব্যস্ত রাখেন। দ্বিতীয় আপিল আদালতের দরখাস্তে "ক" এ মর্মে সকরুণ প্রার্থনা করেন যে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন লংঘন পূর্বক জাল রায় দ্বারা তামাদী

www.pathagar.com

আইন ভঙ্গ করে "খ" পরিচালিত এ বে-আইনী আপিল বাতিল করা না হলে "ক" এর জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। কিন্তু ২য় আপিল আদালতের মাননীয় দুই বিচারপতি "ক" এর এই অন্তিম প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন এই যুক্তিতে যে "তারা এ বিষয়ে বিচারে আগ্রহী নন" (সূত্র: ২২ নং ঢাকা "ল" রিপোর্টাস এর ৫৮৯নং পৃষ্ঠা)। ফলে জাল রায় তৈরীকারী "গ" শাস্তি পেলেও ঐ জাল রায়টি আদালতে আইনগত বৈধতা পাওয়ায় "খ" এর অপরাধের বিরুদ্ধে আইনত শাস্তির সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া ক্ষমতাবান "খ" এর নির্মম নির্যাতনে চাকরিহারা "ক" অতঃপর হার্টফেল করে মারা যান। তার মৃত্যুর পর অভাবের তাড়নায় তার নিরীহ পরিবারটিও ধ্বংস হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় ঘটনায় "ক" একটি থানার ক্ষমতাবান ওসি। তিনি "খ" কে বাদী সাজিয়ে জননিরাপত্তা আইনে (বর্তমানে আইনটি বাতিল) এ মর্মে থানায় কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি মামলা করান যে, ঐ ব্যক্তিরা "খ" এর দোকান ভাংচুর করেছে, যা কারাদন্ডযোগ্য অপরাধ। গ্রেফতার ও রিমান্ডে থাকাবস্থায় পুলিশের চাপের মুখে আসামীরা দোষের স্বীকারোক্তি দিলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট তা লিপিবদ্ধ করেন। ট্রাইব্যুনালে মামলাটির শুনানিকালে জেরায় বাদী "খ" স্বীকার করেন, ওসি "ক" একটি কাগজে তার দস্তখত নিয়েছিলেন। সেই কাগজে কি লেখা ছিল তা তাকে পড়ে শুনানো হয়নি। এ মামলার আসামীদের তিনি চেনেন না এবং তিনি কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা করেননি। জেরায় আসামীরা পুলিশের ভয়ভীতির মুখে স্বীকারোক্তি দেবার কথা বলেন এবং সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করেন যে আসামীদের এই স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করাকালে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৬৪ ধারার (৩) উপধারা অনুসরন করেন নি। [উল্লেখ্য, (৩) উপধারায় বলা হয়েছে "আসামীর স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করাকালে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে বুঝিয়ে বলবেন যে, আপনি এই স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য নন, তাহলে তা আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। তাছাড়া আসামীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকারোক্তি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করা ছাড়া ম্যাজিষ্ট্রেট তা লিপিবদ্ধ করবেন না"।] অতঃপর ট্রাইব্যুনাল জজ

www.pathagar.com

মামলার রায়ে আসামীদের বেকসুর খালাস দেন (সূত্রঃ চাঁদপুর জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং-১/২০০০, রায়- ২৬ জুন ২০০০)। বিনা অপরাধে দীর্ঘ কারানির্যাতন ভোগ ও লাখ লাখ টাকা খুইয়ে নিরীহ আসামীগন মুক্তি পেলেও জননিরাপত্তা আইনের ১১নং ধারা শক্তিমান ওসি "ক" কে স্পর্শও করেনি। উল্লেখ্য, এই আইনের ১১ নং ধারায় বলা হয়েছে, "কেউ যদি কারো বিরুদ্ধে এ আইনে মিথ্যা মামলা দায়ের করেন বা করান, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।"

উল্লেখিত দুটি মামলায় দেখা গেছে, শক্তিমান অপরাধীরা আইন আদালতকে পরোয়া করে না, তারা আইনের শাস্তি এড়িয়ে যেতে সক্ষম, অন্যদিকে একবার তাদের কোপানলে পড়লে নিরীহ মানুষ সর্বস্বান্ত এমনকি প্রাণও হারায়। প্রথম মামলার রায়ে মাননীয় দুই বিচারপতি জ্ঞাতসারে জাল রায়টিকে কেন আইনগত বৈধতা দিলেন ও দ্বিতীয় মামলার রায়ে থানার ওসি ও মাননীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আইন ভঙ্গের বিষয়টি কেন জজ মহোদয় বিনা জবাবদিহিতে মেনে নিলেন এবং নিম্ন আদালতের এসব অনিয়মে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের কোন তদারকি ও খবরদারী আছে কিনা; সে সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে বা সমালোচনা করতে পারবে না। তাহলে আদালত অবমাননা হবে এবং এর শাস্তি সর্বোচ্চ ৬ মাস কারাদন্ড ও দু'হাজার টাকা জরিমানা। গত ৭৬ ব ' থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপেই আদালত অবমাননা আইনটি এভাবে কার্যকর রয়েছে। অর্থাৎ এ আইনে সত্য চাপা দিয়ে রাখার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত। অন্যথা হলে শাস্তি অনিবার্য। সারা বিশ্বে আস্থা ও ন্যায়বিচারের প্রতীক দাঁড়িপাল্লাকে বাংলাদেশে এভাবেই অবিশ্বাসের পোকায় খাওয়া অবকাঠামোয় পরিণত করেছে আমাদের আদালত অবমাননা আইন নামের টিউমারটি।

www.pathagar.com

আদালত অবমাননা আইন যুক্তির সমাধিস্থল

১৯২৬ সালের ৮ মার্চ জারিকৃত এবং একই বছর ১ মে থেকে এক সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে বলবৎ আমাদের আদালত অবমাননা আইনটি খুবই অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে। ফলে কোনটা আদালত অবমাননা আর কোনটা নয় তা কুয়াশাচ্ছন্ন। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি ৬ মাস কারাদন্ড ও দু'হাজার টাকা জরিমানা। প্রসিডিউর কোড ও আদালত অবমাননার জন্য কোন বিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়নি। এ আইনে শুধু আদালতের শাস্তি দানের ক্ষমতা নির্ধারিত আছে। এছাড়া আইনটি নিজেও স্ববিরোধী এবং অসম্পূর্ণ । আইনের "২ নং ধারার ৩নং উপধারায় বলা হয়েছে ,- "যে ক্ষেত্রে অনুরূপ অবমাননা (কোন ক্ষেত্রে-কোনরূপ অবমাননা, তার কিছুই উল্লেখ নেই!) দন্ডবিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য, সে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোন অধস্তন আদালতের কথিত অবমাননার বিষয় আমলে গ্রহন করবেন না ।" অথচ আবার ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে ,- "আরো শর্ত থাকে যে অন্য কোন আইনে অন্যত্র যে কোন কিছু থাকা সত্বেও হাইকোর্ট বিভাগ তার নিজের বা অন্য কোন অধস্তন আদালতের অবমাননার জন্য অত্র ধারায় নির্ধারিত দন্ডের চেয়ে অতিরিক্ত দন্ড আরোপ করবেন না ।" অর্থাৎ ২(৩) ধারায় নিম্ন আদালতের অবমাননার বিষয়টি আমলে না নিতে আইনে যেখানে হাইকোর্টকে বলা হয়েছে আবার সেখানে ৩ নং ধারায় নিম্ন আদালতের অবমাননার বিষয়টিতে নির্ধারিত দন্ড দিতে হাইকোর্টকে বলা হয়েছে-যা সুস্পষ্ট স্ববিরোধীতা ! এটা আরো বিস্ময়কর,- যে কার্যপ্রণালী বিধি বা প্রসিডিওর কোড অনুসারে আদালতের বিচার প্রক্রিয়া চলছে তার কোথাও ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইন কিভাবে প্রয়োগ করা হবে তার কিছুই উল্লেখ নেই এবং আমাদের বিজ্ঞ আইনজীবীগনও এই অসম্পূর্ণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন না। অর্থাৎ প্রসিডিওর কোড এর সুনির্দিষ্ট বিধি বিধান বা নির্দেশনা ছাড়াই আদালত অবমাননা আইন প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাই শুধু নয়। বিচারক, বিচার প্রশাসন, বিচার ব্যবস্থা, বিচার প্রক্রিয়া, বিচারাধীন মামলা, আদালত চত্বর, বিচারাদালতের পরিবেশ, আদালত কিংবা আদালতের রায় কোনটা সমালোচনা করলে অবমাননা হয় তা ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের কোথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। ফলে আদালত অবমাননার অপরাধের ক্ষেত্রে কোন

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট সীমারেখাও নেই। বিচারক যদি মনে করেন আদালত অবমাননা হয়েছে তাহলে রায়ে শাস্তি অনিবার্য। আর যদি বিচারক মনে করেন আদালত অবমাননা হয়নি তাহলে ধরে নিতে হবে এ সংক্রান্ত কোন অপরাধ হয়নি। এ আইনে বিচার হয় বিচারকের সম্পূর্ণ ইচ্ছা নির্ভর। অর্থাৎ আমাদের আদালত অবমাননা আইনটি হচ্ছে যুক্তির সমাধিস্থল। আদালত অবমাননা সম্পর্কে কোন বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা বা মাপকাঠি এ আইনে সংজ্ঞায়িত না থাকায় এই আইনে বিচার করা হয় অনুমাননির্ভর অপরাধে-যা ন্যায়বিচার পরিপন্থী। এ যেন আকাশের যত তারা আদালত অবমাননার তত ধারা। পাকিস্তানে আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। ভারতে ১৯৫২ সালে প্রথমবার এবং ১৯৭১ সালে আদালত অবমাননার দীর্ঘ সংজ্ঞা দিয়ে দ্বিতীয়বার আইনটি সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও পক্ককেশ ব্যারিষ্টারবর্গ আইনটি সংস্কারে দিকনির্দেশনা দিয়ে তা সংশোধনে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করতে পারতেন। গত ৭৬ বছরে তারা জাতির প্রতি এ গুরুদায়িত্ব পালন করেন নি। নিজ পেশাগত দায়িত্বের বাইরে এতটুকু পরিশ্রম বা সময় নষ্ট করতে রাজী নন তারা। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় ১৯৯০ সালের ২ মে থেকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত আইন সংস্কার কমিশন গত এক যুগ ধরে এ বিষয়ে কি করছে তাও দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত। এসব সেকেলে আইন সংস্কারে পর্বতসম রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি মুষিক প্রসব করছে অর্ধ শতাব্দীকাল যাবত। মানুষের কষ্টার্জিত ট্যাক্সের টাকায় আদালতের আভ্যন্তরীণ কর্মকান্ড কেমন চলছে তা জানার অধিকার নেই কারো। বঞ্চিত মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল আদালতের কর্মকান্ডের কোন দুর্নীতি বা ভুলত্রুটির সমালোচনা কিংবা সে সব তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করাই যদি আদালত অবমাননা হবে তাহলে আর দেশটি স্বাধীন করার দরকার ছিল কি? আইনের শাসন সমুন্নত রাখার পন্ডশ্রমে লিপ্ত রাজনীতিবিদরাও এ প্রশ্নে নির্বিকার। (এর অর্থ এই নয় যে দু'একজন বিচারকের দুর্নীতি বা অবিচারের জন্য সব বিচারককে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে।) তবে "আদালত অবমাননা প্রসঙ্গে বিচারক স্যার জর্জ জেসেলের বক্তব্য প্রনিধানযোগ্য । তিনি বলেছেন, যদিও অবমাননার ক্ষেত্রে আদালতের অবাধ ও স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে, তবুও এই ক্ষমতা সতর্কতা এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় । তিনি এই ক্ষমতাকে সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহারের অভিমত দিয়ে বলেন, - অন্য কোন ভাবে প্রতিকার সম্ভব না হলেই কেবল এই অস্ত্র ব্যবহার করা হতে পারে ।" (সূত্রঃ সাপ্তাহিক বিক্রম , ১১ সেপ্টেম্বর-১৯৯৪)

www.pathagar.com

প্রবীণ আইনজ্ঞদের মতে, আদালত অবমাননা অপরাধের মাপকাঠি হওয়া উচিত বিচারক, বিচারকার্য, রায় বা আদালতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক অপবাদ রটনা। তারা আরো মনে করেন, আদালত বা বিচারকের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা, তাদের ক্ষমতাকে অসৎ উদ্দেশ্যে অপদস্থ ও তার বিবরণ ছাপা, আদালতের স্বাভাবিক কর্মকান্ডকে বাধাগ্রস্ত করা কিংবা আদালতের নির্দেশ অমান্য করার উপাদান না থাকলে আদালত অবমাননার কোন অভিযোগই আমলে নেয়া ন্যায্য নয়। এ প্রসঙ্গে ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনের বাইরে দন্ডবিধি ও দেওয়ানী কার্যবিধির সংস্লিষ্ট ধারাগুলোর গ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করা যায়। এই যেমন,- দন্ডবিধি আইনের ২২৮ ধারায় বলা হয়েছে , "কোন বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমে কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারীকে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে অপমান করা বা বাধা প্রদান করলে সে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড ও একহাজার টাকা জরিমানা দন্ডে দন্ডিত হবে" এবং "দেওয়ানী কার্যবিধির ৩৯ আদেশের ৩ নং বিধিতে বলা হয়েছে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অবমাননাকারীকে একই আদালত সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদন্ড দিতে পারেন" যা খুবই ন্যায্য এবং যুক্তি গ্রাহ্য।

অবশ্য ১৯৯৬ সালের পহেলা জুলাই প্রকাশিত দৈনিক দিনকাল এর এক প্রতিবেদনে জানা যায়, আদালত অবমাননার অপরাধ সম্পর্কে ১৬ দফা নির্দেশনা দিয়ে উচ্চতর আদালত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এই নির্দেশনা আবার দুভাগে বিভক্ত। একটা দেওয়ানী অবমাননা অপরটি ফৌজদারী অবমাননা। এক্ষেত্রে সঙ্গত কারনেই একজন সচেতন নাগরিকের জানার অধিকার আছে যে গ্রামে নির্বাচিত চেয়ারম্যান পরিচালিত গ্রাম্য আদালত, শ্রম আদালত, পৌর আদালত ,বিদ্যুৎ বিভাগ , নৌ বিভাগ ইত্যাদি কর্তৃক পরিচালিত আদালত সমূহের অবমাননার ক্ষেত্রে তাহলে কোন নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে এবং উচ্চ আদালতের এই ১৬ দফা নির্দেশনা আজো পর্যন্ত কেন ১৯২৬ সালের আদালত অবমাননা আইনটির সাথে সংস্পৃক্ত করা হয়নি? জনগনের সাথে কেন এতো লুকোচুরি? তবে এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে সরকারকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে বৃহত্তর জনস্বার্থে আদালতের কর্মকান্ড চলবে, নাকি আদালতের কর্মকান্ড জনস্বার্থের উপরে প্রাধান্য পাবে? একবিংশ শতাব্দী জরুরী তাগিদ দিচ্ছে যে, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই জাতীয় সংসদে বিষয়টি সমাধান করা দেশপ্রেমিক সরকার ও বিরোধী দলের আশু কর্তব্য।

www.pathagar.com

মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিচার বিভাগের 'না'

বাংলাদেশে প্রচলিত বৃটিশ ঔপনিবেশিক আইনে বিচারকগণকে সকল ভুলত্রুটির উর্ধ্বে অনেকটা নির্ভুল কম্পিউটারের মত অমানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ক্যাসেট কেলেংকারির আদালত অবমাননা মামলায় আবারো প্রমাণ হলো মাননীয় বিচারকগণ আমাদের মতোই মানুষ। তাঁরা মানবিক ভুলত্রুটির উর্ধ্বে নন। দেশে বিদেশে হাইকোর্টের এই রায়টি তুমুল সমালোচিত হয়েছে, যা অতীতে আর কখনো দেখা যায়নি। প্রশ্ন উঠেছে, যিনি দোষী এবং যিনি দোষ ধরিয়ে দিলেন, সেই উভয়কে রায়ে কারাদন্ড দেয়া হয় কি করে? ঘটনাটি মিডিয়া জগতসহ সারা দেশে এক নতুন ধরনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। দেশের ১৫টি শীর্ষ দৈনিকের সম্পাদক গত ২২ মে ২০০২ এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, এই রায় সাংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর এক নজিরবিহীন হস্তক্ষেপ।

"মূল ঘটনাটি ছিল হাইকোর্টে জনতা টাওয়ার মামলার আসামী এরশাদের সাথে হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি লতিফুর রহমানের মামলা সম্পর্কে আলাপচারিতা। এই আলাপচারিতা ক্যাসেটবন্দী করা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে দৈনিক মানবজমিন একটি রূপকধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এরপর বিচারপতি লতিফুর রহমান পদত্যাগ করেন। এ নিয়ে সুয়োমটো আদালত অবমাননা মামলা হয়। গত ২০ মে ২০০২ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম ও বিচারপতি এ.কে.এম শফি উদ্দিন এ মামলার রায় দেন। রায়ে এরশাদকে ৬ মাসের কারাদন্ড ও জরিমানা এবং মানবজমিন সম্পাদকদ্বয় মতিউর রহমান চৌধুরী ও মাহবুবা চৌধুরীকে জরিমানা করা হয়। তবে মতিউর রহমানকে এক মাসের কারাদন্ডও দেয়া হয়েছে। রায়ে আরো বলা হয়, আংশিক নয় সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশে সাংবাদিক স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিক ও পত্রিকা, সার্কুলেশনের জন্য সেনসেশনাল খবর ছাপাতে পারে না। রায়ে আরো বলা হয়, আদালতের মর্যাদা বিচারপতিদেরই রক্ষা করতে হবে, রায়ের মান বিচারপতিদের চারিত্রিক দৃঢ়তাই মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে বিচারপতি লতিফুর রহমান সম্পর্কে রায়ে কিছু বলা হয়নি (তথ্য সূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ২১ ও ২৩ মে ২০০২)।"

www.pathagar.com

২ মামলায় আদালত নিজেই বাদী, নিজের অভিযোগ আমলে গ্রহণকারী এবং নিজেই বিচারক-যা ন্যাচারাল জাস্টিস এর বিপরীত। আরো যে যে কারণে রায়টি চিন্তাশীল মানুষের বিবেককে প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়েছে তা হচ্ছে আইন সবার জন্য সমান কিনা? আদালতের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে ঝাঁকুনি দিয়েছে এ রায় । প্রশ্ন উঠেছে একই অপরাধে জড়িত বিচারপতি লতিফুর রহমান কি আইনের উর্ধ্বে ? রায়ে বর্ণিত আদালতের মর্যাদা বিচারপতি লতিফুর রহমান রক্ষা না করে যে গুরুতর আদালত অবমাননা করলেন সেজন্য তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবার কথা ছিল। কারণ বাংলাদেশে প্রচলিত ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইনের ৩৫ নং ধারানুসারে "সংঘটিত অপরাধমূলক কাজের প্রকৃত সম্পাদনকারীর সাহায্যকারী ব্যক্তি উক্ত কাজের জন্য এরূপভাবে দায়ী হবে যেন সে নিজেই উক্ত কাজটি করেছে"। এছাড়া দন্ডবিধির ১০৯ নং ধারায় আরো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, "সহায়তা বা প্ররোচনার ফলে কোন কাজ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে এবং উক্ত সহায়তাদানের জন্য শাস্তির স্পষ্ট বিধান না থাকলে সহায়তাকারী যে অপরাধে সহায়তা করেছে সেই অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড ভোগ করবে"। উল্লিখিত রায়ে প্রচলিত এসব আইনের প্রতিফলন নেই। এছাড়া বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ক্ষেত্রে ২৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী" কথাটা এখনো ঠিক আছে তো ? কারণ ২৭নং অনুচ্ছেদ মতে বিচারপতিগণও এদেশের নাগরিক এবং তাদেরওতো আইনের দৃষ্টিতে সমানভাবে গণ্য হবার কথা ছিল। নাকি বিচারকগণ এদেশের নাগরিক নন? কে দেবে এর জবাব ? বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাংলাদেশের কোথাও এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে না । যেদিন এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে, সেদিন হয়তো বে-আব্রু হয়ে যাবে বাংলাদেশের দরিদ্রতার একটি অনুদঘাটিত রহস্যের পাটাতন ।

www.pathagar.com

মত প্রকাশের স্বাধীনতায় পরস্পর বিরোধী আইনের টানা হ্যাঁচড়া

বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৩৯(১) অনুচ্ছেদে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং ৩৯(২)(খ) অনুচ্ছেদে সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। তবে ৩৯(২) অনুচ্ছেদে আদালত অবমাননাসহ ৭টি বাধা নিষেধের শর্ত সাপেক্ষে এ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানবজমিন যেহেতু আদালত অবমাননা আইনে দন্ডিত হয়েছে সেহেতু প্রথমেই আইনটি সম্পর্কে বর্ধিত আলোকপাত করা যাক। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকগণ ১৯২৬ সালে আদালত অবমাননা আইন বলবৎ করে যা স্বাধীন বাংলাদেশে অবিকলভাবে আজো বলবৎ আছে। এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো ১৯২৬ সালে টেপ রেকর্ডারই আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এ আইনে টেপ ক্যাসেট এর কোন ব্যবহার বা তার দোষগুণেরও বর্ণনা নেই। তাছাড়া এ আইনে বিচারাধীন মামলার আসামীর সাথে আদালতের বিচারপতির কথোপকথন এবং তা টেপ রেকর্ডারের ক্যাসেটে ধারণ করা কিংবা তার বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশ হবার পর ঐ বিচারপতিকে বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সাংবাদিককে জেলদন্ড দেবার কোন বিধানই আদালত অবমাননা আইনের কোথাও উল্লেখ নেই।

অন্যদিকে বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ২০২ ধারায় বলা হয়েছে, "যদি কোন ব্যক্তি কোন অপরাধ সংঘটনের সংবাদ দিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদটি না দেয় তাহলে উক্ত ব্যক্তি ৬ মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা জরিমানা অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবে।" এই আইনানুসারে ক্যাসেট কেলেংকারির অপরাধের সংবাদ দিতে দৈনিক মানবজমিন সম্পাদকের পেশাগত বাধ্যবাধকতা ছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদটি তিনি না দিলে বরং তা যদি পরে আদালতের গোচরীভূত হতো তাহলে দন্ডবিধির ২০২ ধারায় তিনি নির্ঘাত দন্ডিত হতেন। এমন শাঁখের করাত আইন ব্যবস্থার মধ্যে তাহলে একজন সাংবাদিক যাবে কোথায়? সংবাদপত্র ও সাংবাদিক পীড়নে এরপর আরো আছে অফিসিয়াল সিক্রেট এ্যাক্ট, পোষ্টাল এ্যাক্ট, দন্ডবিধির ৫০০, ৫০১ এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৪ ধারার অপব্যবহার। একজন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকের তাহলে নির্বিঘ্নে পেশাগত দায়িত্ব পালনের উপায় কি? মহামান্য আদালত এ ব্যাপারে একটা গাইড লাইন দিলে সংবাদপত্র সেবীদের উপকার হতো।

www.pathagar.com

"জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানে সরকারকে বাধ্য করতে আমেরিকায় একটি আইন আছে যার নাম Freedom of information Act.এই আইন দ্বারা যে কোন ব্যাক্তি-, সরকার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সংবাদ সরবরাহ করতে বাধ্য করতে পারে। (সূত্রঃ দৈনিক আলআমিন,৩ জুলাই ১৯৯২)" মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের কয়েকটি ব্যতিক্রমি উপধারাতেও খুব চমৎকার নিশ্চয়তা দেয়া আছে যদিও তা আদালত অবমাননা মামলায় মান্য করা হয়েছে এমন নজির নেই। বাংলাদেশ দন্ডবিধি আইনের ৪৯৯ নং ধারার "১ম ব্যতিক্রম" উপধারায় বলা হয়েছে, জনসাধারণের কল্যাণের দিক থেকে যে তথ্য প্রকাশ করা উচিত, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে অনুরূপ তথ্য প্রকাশ করা মানহানির অপরাধ হবে না। একই আইনের "২য় ব্যতিক্রম" উপধারায়, কোন সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সরকারী দায়িত্ব পালনকালে তার আচরণ বা চরিত্র সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোন মতামত ব্যক্ত করা হলে তা মানহানির অপরাধ হবে না এবং "৬ষ্ঠ ব্যতিক্রম" উপধারায় বলা হয়েছে, জনসাধারণের বিচারার্থে উপস্থাপিত কোন কার্য বা ঐ কার্যে কর্মকর্তার চরিত্র যতদূর প্রতিফলিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোন মতামত প্রকাশ করা হলে তা মানহানির অপরাধ হবে না। ক্যাসেট কেলেংকারীর উল্লেখিত রায়ে দেখা গেছে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এসব আইনের গ্যারান্টি কোন রক্ষাকবচই ছিল না। সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ,আইন বইতে উল্লিখিত আইনগুলো কি তাহলে অযথাই আইন বই'র শোভা বর্ধনের জন্য রাখা হয়েছে; না কি এসব আইন বিশ্বাস করা সরলপ্রাণ মানুষকে আদালত অবমাননা মামলার ফাঁদে ফেলার জন্য রাখা হয়েছে ? উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত আর্ন্তজাতিক মানবাধিকার সনদের ১৯ ধারায় বলা হয়েছে, "প্রত্যেকেরই মতামতের ও মতামত প্রকাশের স্বাধিকার রয়েছে; বিনা হস্তক্ষেপে মতামত পোষণ এবং যে কোন উপায়াদির মাধ্যমে ও রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষ তথ্য ও মতামত সন্ধান, গ্রহণ ও জ্ঞাত করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্ত র্ভুক্ত।" জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ পালনে জাতিসংঘের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাংবাদিক নিপীড়নে দেখা গেছে কি সরকার, কি বিচার বিভাগ কেউই এই সনদের কোনই তোয়াক্কা করছেন না।

www.pathagar.com

বিচারক কি সমালোচনার উর্ধ্বে ?

যে বৃটিশরা ১৯০ বছর আমাদেরকে শাসনের সময় বিচারকের সমালোচনা না করার ছবক দিয়েছিল, তারা তাদের স্বদেশে বিচারকদের অহরহ সমালোচনা করছে। এজন্যই বৃটেন উন্নত আর বাংলাদেশের দরিদ্রতা শেষ হচ্ছে না। বৃটিশরা মনে করে সমালোচনা করতে না দেয়ার অর্থ হলো ভুলকে প্রশ্রয় দেয়া। ভুলকে প্রশ্রয় দেয়ার অর্থ সুবিচারকে বাধাগ্রস্ত করা। আর যে দেশে সুবিচার নেই, সে দেশে সমস্যারও সমাধান নেই।

"১৯৯৮ সালের পহেলা মে তারিখে বৃটেনের বহুল প্রচারিত সানডে টাইমস পত্রিকায় "কর্কশ অন্যায় ও সিদ্ধান্তহীনতার জন্য বিচারপতিরা দোষী সাব্যস্ত" শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ হয়। শিরোনামের উপর উইগ পরিহিত চারজন বিচারপতির ছবি। প্রতিটি ছবির নিচে বিচারপতির নাম ও ক্যাপশনে তার সম্বন্ধে মূল্যায়নসূচক কঠোর মন্তব্য এবং তার নিচে মূল্যায়ন স্কোর অর্থাৎ বিচারপতি হিসেবে তিনি কত নাম্বার পেয়েছেন তা বলা হয়েছে। লন্ডন এবং ওয়েলস - এর ল' চেম্বারের ২'শ ৯৫ জন ব্যারিস্টারের মতামত জরিপের ভিত্তিতে এ প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। ১'শর মধ্যে ৩৫ নাম্বার দেয়া বিচারপতি প্রেন্ডারগার্ষ্ট এর যোগ্যতা বিচারে মূল্যায়ন ছিল, তাঁর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা দুর্বল, ৩২ নাম্বার দেয়া বিচারপতি আয়ান কেনেডির মূল্যায়ন, তিনি ভদ্র আচরনশূন্য, ৪৬ নাম্বার দেয়া বিচারপতি মাইকেল কেনেডির মূল্যায়ন হলো, তাঁর আদালতের শুনানী অতি দীর্ঘ এবং ৪৭ নাম্বার দেয়া বিচারপতি জিওফ্রে কিলফয়েল সম্পর্কে মূল্যায়ন ছিল তাঁর রায় প্রশ্নের সম্মুখীন। ঐ রিপোর্টের শিরোনামের পাশে একটি হাতুড়ি আঁকা হয়েছে। বিচার কাজে ব্যবহৃত বিচারকদের হাতুড়ি পেটার শব্দে আদালতে কোলাহল স্তব্ধ হয়। আর এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বিচারকদের স্তব্ধ করতে জনগণের পক্ষে হাতুড়ি পেটাচ্ছেন সানডে টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদক। দীর্ঘ এই প্রতিবেদনে প্রতিবেদক আরো একটি মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন যে, মান্যবরবৃন্দ আরো ভালো করতে পারতেন।" (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক সংবাদ, ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯)।

বাংলাদেশে এমন ঘটনা প্রকাশতো দূরের কথা; কল্পনা করাও বিপজ্জনক। অথচ প্রতিবেদনের কোথাও বিচারকের সম্মানহানি হয়নি। এটা সেদেশে স্বাভাবিক মত প্রকাশের স্বাধীনতায় মৌলিক অধিকার প্রয়োগের স্বাভাবিক দৃষ্টান্ত। তাই এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকা ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননা বা মানহানির মামলা হয়নি। প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য ছিল বিচারকগণকে আরো সজাগ ও কর্মক্ষম করে তোলা। বিচারকগণও সহনশীলতা ও উদারতা দিয়ে রিপোর্টটি

www.pathagar.com

মোকাবেলা করে জনআস্থা বৃদ্ধিতে চেষ্টা করেছেন। আর এদিকে সংবাদপত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে আমাদের বিচারকগণ একমত নন। বিচার বিভাগকে বাদ দিয়ে এ স্বাধীনতায় তারা সন্তুষ্ট। এ ব্যাপারে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় প্রধান বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "সংবিধান, প্রচলিত আইন ও নিজের বিবেক ছাড়া বিচারপতিদের জবাবদিহিতার প্রশ্নই ওঠে না (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২ মার্চ ২০০১)। " কিন্তু সংবিধান ও প্রচলিত আইনে কোন বিচারক কোথাও জবাবদিহি করেছেন অন্তত এমন আজগুবী কথা এদেশবাসী কোনদিন শোনেনি। একই কারণে বিচারপতি লতিফুর রহমানকে কোথাও জবাবদিহি করতে হয়নি। কারণ আইনের এসব জবাবদিহিতার ব্যবস্থা খুবই দুর্বল করে রাখা হয়েছে। আর বিবেক যদি নিজেই বিচারপতি লতিফুর রহমান হয়ে যায় তখন এ পচা বিবেকের কাছে কিভাবে জবাবদিহিতা হবে? তবে জবাবদিহিতার প্রশ্নে আমাদের সাবেক দু'জন প্রধান বিচারপতি এদেশের মানুষের মনের কথাগুলো বলেছিলেন। সাবেক অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ বলেছেন, "বিচারকদের আচার আচরণে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক মিল্লাত ১৫ মার্চ ১৯৯২)।" প্রধান বিচারপতিকে প্রদত্ত সংবর্ধনার জবাবে প্রধান বিচারপতি এম.এইচ রহমান যে বক্তব্য রেখেছিলেন "ডিএলআর ফেব্রুয়ারী ৯৫" সংখ্যায় তা "বিচারকের রায়ের সমালোচনা করার অধিকার বাকস্বাধীনতার অংশ" শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। বক্তব্যে তিনি বলেন, "দেশের লোকের টাকায় কোর্ট চলছে এবং দেশের লোকের অধিকার আছে কোর্ট কেমন চলছে তা জানার। কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে সেই অভিযোগ প্রেরণ, গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সহজ বিধান হিসেবে অনেক দেশের মতো আমাদের দেশের বিচারকার্য সম্পাদন কমিশন গঠন করা যেতে পারে। একটা বিধিবদ্ধ অভিযোগ পদ্ধতি না থাকলে বেনামি চিঠির পাহাড় জমে উঠবে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, কোন বিচারকই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। সভ্য জগতে ভব্য সমালোচনার একটা অবকাশ রয়েছে। বিচারকের রায়ের সমালোচনা করা বাকস্বাধীনতার এক অংশ বলে আমি মনে করি। আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে সংবিধানে এই বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। এই মৌলিক অধিকারের আলোকে আমাদের আদালত অবমাননার আইন সংশোধনের প্রয়োজন। ইংল্যান্ড, ভারত ও
পাকিস্তানে এ আইন পরিবর্তন করা হয়েছে (সূত্রঃ দৈনিক বাংলার বাণী ২৮ নভেম্বর ১৯৯৫)।"

www.pathagar.com

বিচারকগণ কি আইনের উর্ধ্বে ?
দেড়'শ বছরের প্রতারণা

হ্যাঁ বিচারকগণ আইনের উর্ধ্বে ! অত্যন্ত দুর্বোধ্য ভাষার মারপ্যাঁচে রচিত আমাদের আইন ব্যবস্থা অন্তত তাই বলে। এই যেমন- বেআইনি কাজের সংজ্ঞা সম্পর্কে দন্ডবিধি আইনের ৪৩নং ধারায় বলা হয়েছে, "কোন আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ এবং দেওয়ানী মামলা দায়ের করার বিষয় হতে পারে এমন সকল কাজকে বেআইনি কাজ বলা হয়।" অথচ ১৮৫০ সালের বিচার কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের রক্ষা আইন (The judicial officers protection act: 1850) অনুসারে "কোন বিচারক তার বিচারিক দায়িত্ব পালনকালে তার এখতিয়ার থাকুক বা না থাকুক কোন কাজ সরল বিশ্বাসে করে থাকলে তার বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে কোন মামলা চলবে না।" অন্যদিকে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইনের ৭৭ নং ধারায় বলা হয়েছে,-" বিচারক এখতিয়ার বহির্ভূত ভাবে বিচারকাজ করলেও যদি তা সরল বিশ্বাসে করা হয়, তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গন্য করা হবে না ।" এসব আইনী প্যাঁচালো কথার সারমর্ম হলো, কোন বিচারক বিচারাদালতে আইন বহির্ভূত কাজ করলেও তা বেআইনি কাজ নয় ! আত্মরক্ষার ঢাল হিসেবে শুধু "সরল বিশ্বাসে" শব্দটির আশ্রয় নিতে হবে! আইনে এই "সরল বিশ্বাসে" শব্দটির কোন মাপকাঠি বা সীমারেখা নির্ধারিত না থাকায় তা ক্ষমতার অপব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ঢালাও সুযোগ রয়েছে। অবশ্য ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৯৭(১) ধারানুসারে "দায়িত্ব পালনকালে কৃত অপরাধের জন্য বিচারকের বিচার করা যাবে; তবে শর্ত হলো এজন্য সরকারের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে"। ফৌজদারী কার্যবিধির এই ১৯৭(১) ধারাটিও অস্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ। এতে সরকারের কোন বিভাগের, কার কাছ থেকে, কিভাবে অনুমতি নিতে হবে এবং কথিত সেই অনুমতি কতোদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে তার কিছুই উল্লেখ নেই। বাস্তবতা হলো এই অনুমতি কোনদিনই পাওয়া যায় না । এছাড়া যেখানে সমগ্র দেশবাসী দুর্বোধ্য আদালত অবমাননা মামলার ভয়ে তটস্থ থাকে, সেখানে সরকারের নির্বাহী বিভাগের কার এমন বুকের পাটা আছে যিনি চাকরিচ্যুতিসহ আদালত অবমাননা মামলার ঝুঁকি নিয়ে কোন বিচারকের অপরাধের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার অনুমতি দেবেন? শুধু তাই নয়, দেশবাসীর চোখে ধুলো দিতে ১৮৬০ সালের দন্ডবিধি আইনের ২১৯নং ধারায় বলা হয়েছে, "বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের কোন পর্যায়ে যদি কোন সরকারী কর্মচারী দুর্নীতি বা দুরভিসন্ধিমূলকভাবে কোন রিপোর্ট

www.pathagar.com

আদেশ রায় বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।" গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে এ আইনে কোন বিচারকের সাজা হওয়া দূরের কথা; কোথাও কোন মামলা দায়ের হবার কথাও শোনা যায়নি। কারণ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি নিরোধ আইনের কোথাও দন্ডবিধির ২১৯ নং ধারাকে তপছীলভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ আমাদের আইন ব্যবস্থা বলে বিচারক দুর্নীতি বা বেআইনী কাজ করেন না, যা সাংবিধানিক আইনের সাথেও সাংঘর্ষিক। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং ২৬(১) ও (২) অনুচ্ছেদের, সাংবিধানিক আইনের সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হয়ে যাবে বলে যে গ্যারিন্টি দেয়া হয়েছে তাও মানা হচ্ছে না। অর্থাৎ সংবিধানের ২৭নং অনুচ্ছেদ, দন্ডবিধি আইনের ২১৯ নং ধারা এবং ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৯৭ (১) ধারায়, বিচারকের দুর্নীতির বিচারের যে,গ্যারিন্টি দেয়া হয়েছে তা সরাসরি বাতিল করে দিচ্ছে দন্ডবিধি আইনের ৭৭ নং ধারা এবং ১৮৫০ সালের জুডিশিয়াল অফিসার্স প্রোটেকশন এ্যাক্ট! জাতির সাথে এ ঐতিহাসিক প্রতারণা চলছে গত দেড়'শ বছর ধরে। বৃটিশ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম বিশ্ব কাঁপানো স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের বীর নায়কদের ফাঁসীর বেদী ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কটির প্রতি যেন আজো উপহাস করছে বৃটিশদের প্রবর্তিত ১৮৫০ সালের স্বৈর আইনটি, যে আঁইন রচিত হয়েছিল ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র ৭ বছর আগে। অন্যদিকে বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ (২) অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" এই অনুচ্ছেদ মতে ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রবর্তনের সাথে সাথেই দন্ডবিধির ৭৭ নং ধারা এবং ১৮৫০ সালের সেই আইনটি (যে আইন সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত, " সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান" এর নিশ্চয়তাকে প্রত্যাখ্যান করছে) বাতিল হবার যোগ্য ছিল। কিন্তু বৃটিশদের তৈরী স্বেচ্ছাচারী সেই আইনগুলো আজো বাতিল না করে জাতির সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের ৯৬(৫)খ এবং ৬ অনুচ্ছেদে বিচারকের যে দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা খুবই অস্পষ্ট ও হেঁয়ালীপূর্ণ। উল্লেখিত অনুচ্ছেদ মতে, "গুরুতর অসদাচরণে অভিযুক্ত বিচারকের বিষয়টি রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে তদন্তের নির্দেশ দিবেন এবং তদন্তের রিপোর্টের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি ঐ বিচারককে তার পদ থেকে অপসারণ করবেন।" এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হলো, গুরুতর লঘুতর বা

www.pathagar.com

সদাচরণ অসদাচরণ নিয়ে দিনের পর দিন চুলচেরা বিশ্লেষণ করা গেলেও সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদেই এ সহজ কথাটা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে একজন বিচারক যদি বিচারাদালতে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বা সজ্ঞানে প্রচলিত আইনের শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ একজন নাগরিক আইন-আদালতে তার প্রতিকার পাবে কিনা? তাই শুধু নয়। আইনী পরিভাষায় "অসদাচরণ" এর অর্থের আবার রকমফের আছে। ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি নিরোধ আইনের ৫ নং ধারায় "সরকারী কর্তব্য সম্পাদনে অপরাধজনক অসদাচরণ" এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া আছে, কিন্তু সংবিধানের ৯৬ (৫) খ এবং ৬ অনুচ্ছেদ বর্ণিত "গুরুতর অসদাচরণ" এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে অসদাচরণের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ১৯৭৯ সালের সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধির ২ (চ) ধারা মতে উপরস্থ কর্মকর্তার আইন সংগত আদেশ অমান্য করা, কর্তব্যে চরম অবহেলা, আইনসংগত কারণ ছাড়া সরকারের কোন আদেশ সার্কুলার ও নির্দেশাবলীকে বিদ্রুপ করা এবং কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে নগ্ন, বিরক্তিকর, মিথ্যা বা তুচ্ছ অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করাকেই "অসদাচরণ" বলা হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই বিধিতে কোন নাগরিকের প্রতি কোন সরকারী কর্মচারীর বে-আইনী আচরণকে কোথাও "অসদাচরণ" হিসেবে গণ্য করা হয়নি। বরাবরের মতো এখানেও উপেক্ষিত থেকেছে জনস্বার্থ! অনুসন্ধানে দেখা গেছে,এ বিধিটিও বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত ১৯৩০ সালের ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেস (শ্রেণীবদ্ধ, নিয়ন্ত্রন এবং আপিল) এবং ১৯৬৪ সালের তদানিন্তন পাকিস্তান সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধির বাংলাদেশী অনুকরন মাত্র। জনগণের প্রতি শাসক শ্রেণীর অসদাচারণের এ হচ্ছে আরেকটি অসাধারণ প্রমাণ মাত্র। অথচ সংবিধান, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও আইন-আদালতসহ রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডই চলছে জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে? শুধু তাই নয়, সংবিধানের ১১৬ ক, অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।" এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবী রাখে যে, অন্যের আইনগত স্বাধীনতা যেন কেউ ক্ষুন্ন না করতে পারে সে উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৯(২) অনুচ্ছেদে যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে আইনের ৭টি বাধানিষেধের শর্তের বেড়াজালে দায়বদ্ধ করা হয়েছে সেখানে ১১৬ক, অনুচ্ছেদে "প্রচলিত আইনের বিধিনিষেধের শর্ত সাপেক্ষে" শব্দটি অন্তর্ভুক্ত না করে "সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে" এর মতো শঠতাপূর্ণ শব্দের আশ্রয় নেয়া হয়েছে; যাতে করে আইন ভঙ্গ করেও বিচারক আইনের উর্ধ্বে বিবেচিত হন। "আইন সবার জন্য সমান" কথাটা যে কি পরিমান অসত্য এ হচ্ছে তারই একটা হাতেনাতে প্রমাণ। এভাবে বিভিন্ন আইনের পরস্পর বিরোধী ও চতুর্মুখী গোলক ধাঁধার কারণে প্রচলিত

www.pathagar.com

আইনভঙ্গকারী কোন বিচারকের অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার পাবার কোন আইন নেই এদেশে। এমনকি স্বাধীনতার ২৯ বছর পর দু'হাজার সালে প্রথম গঠিত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রবর্তিত বিচারকদের জন্য যে ১৪ দফা আচরণবিধি প্রণীত হয়েছিল, সেই আচরণবিধি লংঘনের বিরুদ্ধেও কার্যকর জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। শাসক শ্রেণী এই দেশের সরলপ্রাণ জনগণের সাথে কি অভাবনীয় পর্যায়ে প্রতারণা করতে পারে এসব হচ্ছে তারই অকাট্য প্রমাণ মাত্র? গত ২৩ জুলাই ২০০২ দৈনিক যুগান্তর- এর উপ-সম্পাদকীয়তে যথার্থভাবে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এই বলে যে, "সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল আজো কেন ঘুমিয়ে? এ পর্যন্ত কোন একজন বিচারকের অপসারণতো দূরের কথা কোন প্রকার কথিত অসদাচরণ আনুষ্ঠানিকভাবে খতিয়ে দেখার মতো তৎপরতায় কাউন্সিল নিজেকে শামিল করেনি।"

এভাবে বিচারকগণকে সকল দোষত্রুটির উর্ধ্বে স্থান দেয়া হলেও বিচারপতি লতিফুর রহমান, দেশবাসীর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেলেন যে, বিচারক মানবিক দোষগুণের উর্ধ্বে কোন ঐশী ক্ষমতার অধিকারী নন। গত ৭ মে ২০০০ সালে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রবর্তিত বিচারকদের জন্য ১৪ দফা আচরণবিধির (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো ২৬ মে ২০০০) ১,২,৩, ও ৫ নং ধারা সরাসরি লংঘন করেছেন বিচারপতি লতিফুর রহমান। ১নং ধারায় "একজন বিচারক তার সততা এবং বিচার বিভাগের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখবেন", ২নং ধারায়, বিচারক সকল ধরনের বিভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তিজনক কাজ থেকে দূরে থাকবেন, ৩নং ধারায়, বিচারক তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব নিরপেক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন এবং ৫নং ধারায় বলা হয়েছে, একজন বিচারক তার পদমর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য বিভিন্ন বিষয় থেকে দূরে থাকবেন। এ প্রসঙ্গে ঢাকা ভার্সিটির খ্যাতিমান প্রফেসর ড. মাফতাব আহমদ গত ২৫ মে ২০০২ দৈনিক ইনকিলাবে যথার্থ প্রশ্ন রেখেছেন এই বলে যে, "বিচারকের সঙ্গে এরশাদের গোপন শলাপরামর্শ হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পদত্যাগের সহজ পথটি বাতলে দিয়ে এবং সকল আর্থিক সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে কি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়নি?" এখানে আরো প্রশ্ন যে, পদত্যাগ করলেই যদি আইনের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায় তাহলে এককালের দোর্দন্ড প্রতাপশালী সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ ১৮টি মামলার ঘানি টানছেন কেন? পদত্যাগ করেও তো তিনি আইনের শাস্তির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না? কোথায় পাওয়া যাবে এ প্রশ্নের জবাব? বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থা এ প্রশ্নের জবাব দিতেও অক্ষম।

www.pathagar.com

বিচার বিভাগের জবাবদিহিতা কেন?

আদালত অবমাননার ভয়ে আমরা যে কথা বলতে পারিনা সেকথা সারা বিশ্বে প্রচার করে দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। "বিশ্বব্যাংকের মতে, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সবচেয়ে আস্থাহীন প্রতিষ্ঠান" (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর, ৪ এপ্রিল ২০০০)। আমাদের বিচার বিভাগের আভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ও চেইন অব কমান্ড ঠিক থাকলেও নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার তথা জনগণের কাছে এ বিভাগের জবাবদিহিতা এবং দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। সাবেক আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ বলেছিলেন, "জবাবদিহিতা ছাড়া বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংহত হতে পারে না" (সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ জুন ১৯৯৩)। বহুল আলোচিত মাজদার হোসেন মামলার রায়ে নির্বাহী বিভাগের খবরদারী থেকে মুক্ত করে বিচার বিভাগের আরো অধিক স্বাধীনতা দিতে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে আইন মন্ত্রণালয় এখন দিনরাত কাজ করছে। এতে বিচার বিভাগের জবাবদিহিতার বিষয়টি থাকছে কিনা তা অস্পষ্ট। ততোধিক অস্পষ্ট বিচার প্রক্রিয়ার যুগোপযোগী সংস্কার অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি? বর্তমানে মামলার রায় প্রদানের সময়সীমা বিচারকের মর্জির স্বাধীনতার ওপর ন্যস্ত থাকায় ২০/৫০ বছরের মধ্যে কবে আদালতের রায় পাওয়া যাবে তা বাদী বিবাদী কেউ জানে না-যা অবিচারেরই নামান্তর। এরকম দায়বদ্ধহীন স্বাধীনতা অসংখ্য নির্দোষ মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারে পচিয়ে মারার এবং দরিদ্র মানুষের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ হারানোর অন্যতম কারণ।

নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতা সিষ্টেমকে দায়িত্বহীন, দুর্নীতিপরায়ণ ও বেপরোয়া করে তুলতে পারে। সৎ সমালোচনা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা না থাকলে স্বেচ্ছাচারী হতে পারে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। জবাবদিহির উর্ধ্বে থাকা যে কোন সামরিক সরকার বা ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৫৪ (উপধারা-প্রথমতঃ) ধারা (যা পুলিশ নাগরিক জীবনের উপর অহরহ প্রয়োগ করে থাকে) এর উৎকৃষ্ট

www.pathagar.com

প্রমাণ। জবাবদিহিতা হচ্ছে নিয়ম শৃংখলার প্রধান শর্ত। সামরিক ডিক্টেটরগণ সমালোচনার অভাবে ভুলের পাহাড় রচনা করেন, যা পরে জনদুর্ভোগ বয়ে আনে। সমালোচনার সুবাতাসে একজন মন্দ বিচারকও হতে পারেন সুবিচারক। সমালোচনার উর্ধ্বে রাখলে নির্লিপ্তভাবে অবিচার করার সুযোগ দেয়া হয়। নিভৃতে কেঁদে মরে সুবিচার। জনপ্রশাসনতো সারাক্ষণই সমালোচনাবিদ্ধ হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীবর্গ সমালোচনায় বিধৌত হচ্ছেন অহর্নিশি। তাদেরকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে সংসদে। তাহলে বিচার বিভাগ কেন সমালোচনার উর্ধ্বে থাকবে; যেখানে বিনা বিচারে নিরীহ মানুষ বছরের পর বছর জেলে পচে মরে, নির্দোষ মানুষের সাজা হয়ে যায়, একটা মামলা ২০/৫০ বছর চলে, উচ্চ আদালতে রায় দেবার পরেও সম্পত্তি উদ্ধার হয় না, মামলার নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যায় না এবং বেকসুর খালাস পাবার পরেও মানুষ বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকে? এসব মানবতাবিরোধী অপরাধের জবাবদিহিতা চাওয়া কি পাপ হবে? বঞ্চিত নাগরিকের শেষ আশ্রয়স্থল বিচার বিভাগে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা না থাকলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সম্ভবনা কতটুক; তা লাঞ্ছিত ফালু মিয়াদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের দেখতে হবে যুগের পর যুগ ধরে অসহায় দর্শকের মতো?

www.pathagar.com

দু'জন বিচারকের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক ধাঁচের আইন আদালত

বিশ্বের কোন সভ্য দেশে বিচারকদের সংগঠনের কথা কল্পনাও করা যায়না। বাংলাদেশ আছে যে সংগঠনের নাম হচ্ছে "বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিচার) এসোসিয়েশন"। আড়াইশো বছর লাগাতার অনিয়মে সমাজের ভিত যেখানে নড়বড়ে হয়ে গেছে ,সেখানে এ রকম সংগঠনের অস্তিত্ব থাকায় অবাক হবার কিছুই নেই । তা সত্বেও এ সংগঠনের সাম্প্রতিক প্রকাশিত স্মরণিকায় ঢাকা'র যুগ্ম জেলা জজ মোহাম্মদ আলতাফ হোসাইনের লেখা" আমাদের বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে করণীয়" প্রবন্ধটি হয়তো অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছে। এ লেখায় তিনি প্রমাণ করেছেন , দেশে প্রচলিত মান্ধাতা আইনগুলোর ত্রুটি সম্পর্কে বিচারকগণ সচেতন। এসব আইনের কারনে সীমাহীন জনদূর্ভোগ সহ বিচারকদের অসহায়ত্বের কথাও তার লেখায় ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি বিচারকগণও যে এ দেশকে ভালবাসেন এদেশের জনগনের মঙ্গল চান এবং এসব মান্ধাতা আইনের সংস্কার চান, তা তাঁর লেখায় পরিস্কার। অন্যদিকে প্রায় অভিন্ন ঔপনিবেশিক আইনে প্রতিবেশী ভারতের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সে দেশের একজন বিচারকের দৃষ্টিভিঙ্গ বর্ণনা করেছেন আরেকজন বিচারক "আওয়ার জুডিশিয়াল সিষ্টেম" নামক গ্রন্থে । ভারতের প্রখ্যাত বিচারক মিঃ গোপাল দাস খোসলার সেই লেখার অংশ এবং ঢাকার যুগ্ম জেলা জজে'র পৃথক পৃথক লেখা দু'টির গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল,-

"যুগ পরিক্রমায় বিচার ব্যবস্থায় এসেছে নানা পরিবর্তন, ক্রমান্বয়ে উন্নত ও আধুনিক হয়েছে বিচার ব্যবস্থা। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর বিচার ব্যবস্থা যে মানে পৌঁছেছে আমাদের বিচার ব্যবস্থা নানা কারনে তা হতে পেছনে পড়ে আছে। আমাদের বিচার ব্যবস্থায় ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যে সব বাধা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে আইনের ত্রুটি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় আইনের অভাব, প্রচলিত আইনের অকার্যকারিতা এবং বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা উল্লেখযোগ্য। বাণিজ্য উপলক্ষে ইংরেজ বণিকগন এদেশে এসে প্রায় দু'শ বছর এদেশ শাসন ও শোষণের সুযোগ পেয়ে এ সকল আইনের জন্ম দিয়েছিল। দূর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজো সেই আইনের অনুসরণ করছি-যা কোন ক্রমেই কাম্য নয় । যেমন ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইন, ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন , ১৮৬০ ও ১৮৯৮ সালের দন্ডবিধি ও ফৌজদারী আইন সহ অন্যান্য অনেক আইন বৃটিশ প্রণেতারা তাদের দেশে অনুসরণ না করলেও তা আমাদের দেশে

www.pathagar.com

এখনও বলবৎ রয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার দীর্ঘদিন পর আজও আমরা এসব আইন চালু রেখেছি যা দূর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কি? বিচারের জন্য সামাজিক ও আর্থসামাজিক অবস্থা, অপরাধের পরিমান ও গুনগত বিবর্তনের সাথে সময়োপযোগী আইন চাই । সংসদ আইন প্রণয়নের স্থান । জনগণের প্রতিনিধি সংসদ সদস্যগণ এখানে বসে জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। আর এ আইন প্রণয়নের জন্য চাই সুস্থ গনতন্ত্রের বিকাশ, চাই দেশে একটি গনতান্ত্রিক সরকার ও সংবিধান। দুঃখজনক হলেও সত্য আজও আমাদের সংসদ দেশকে তেমন উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী আইন ব্যবস্থা উপহার দিতে পারেনি। অবশ্য অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন আইন তৈরি হলেও সঠিক সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায়, অপরাধ দমনে ও মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি। আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মানুষ যেখানে মানহানী ও ক্ষতিপুরণের সামান্য অধিকার খর্ব হলেই আইনের আশ্রয় পাচ্ছে সেখানে আমাদের দেশের মানুষ তার প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিত হয়ে, সহায় সম্পদ হারিয়ে ,জীবন হানির শিকার হয়েও আইনের আশ্রয় চেয়ে কেবলই দূর্ভোগ ও হয়রানির শিকার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত প্রাপ্য অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে অহরহ । আর এজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী আইনের অপ্রতুলতা, অকার্যকারিতা ও বিচার প্রাপ্তির দীর্ঘসূত্রীতা। ইদানিং এ ব্যাপারে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিছুটা হলেও নজর দিয়েছেন বলে মনে হয়। কিছু কিছু পদক্ষেপ ইতোমধ্যে নেওয়া শুরু হয়েছে এবং আরো কিছু পদক্ষেপের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে আরও ত্বরিত ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া আশু প্রয়োজন।..... দুর্নীতি যাতে বিচারালয়ে প্রবেশ করতে না পারে বা নিম্নতম পর্যায়ে রাখা যায় সে ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।..... অন্যদিকে বিচারকের কাজের প্রতি তদারকি করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও থাকা দরকার। (সূত্রঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিচার) এসোসিয়েশন প্রকাশিত স্মরণিকা,-২০০২ইং, পৃষ্ঠা-১২৯)। অন্য দিকে কোর্ট অঙ্গনের বর্তমান পরিবেশ সম্পর্কে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিশিষ্ট বিচারক মিঃ গোপাল দাস খোসলা লিখেছেন,- "যদি মেগাস্থিনিসের প্রেতাত্মা এখন এদেশ সফরে আসতেন তাহলে এদেশের অপরাধী ও মামলার পক্ষগণের চরিত্রহীনতা এবং তারা যে মিথ্যাচারে কত পারদর্শী দেখে অবাক হতেন। তিনি শুনতে পেতেন একজন অন্য জনকে বলছে- এবার সত্য কথা বল এটা কোর্ট নয়। তিনি দেখতে পেতেন মানুষ আদালতের প্রতি কত তুচ্ছ সম্মান পোষণ করে। এমনকি সরকারী কর্মকর্তারাও যারা বিচারকার্যে নিয়োজিত, তাদের প্রতি কত অবমাননাকর মনোভাব পোষণ করে। (সূত্রঃ নিরীক্ষা-জুলাই/সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ইং সংখ্যা)।"

www.pathagar.com

ঐতিহাসিক সুযোগটি কাজে লাগাতে হবে

উল্লিখিত পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক প্রয়োজনে গঠিত বিচার ব্যবস্থা আমাদের স্বাধীন দেশের জনগণের চাহিদা মোটেই পূরণ করতে পারছে না। "সম্প্রতি ইউএনডিপি'র জননিরাপত্তা বিষয়ক তথ্যে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে জনগণ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।" (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০২) "অর্থনীতি গণতন্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান সব ক্ষেত্রেই হতাশাব্যাঞ্জক" (সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ অক্টোবর ২০০২) মূলত এ বিচার ব্যবস্থা এদেশের উন্নয়ন সহায়ক নয় যা গত ৩১ বছরে বার বার প্রমানিত হয়েছে। প্রমানিত হয়েছে বাংলাদেশ টিকে আছে টিকে থাকবে এবং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে, এডিবি, আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও দেশ বিদেশের দয়া দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে। বেঁচে থাকতে হবে সন্ত্রাসের কাছে সমর্পিত নিরুপায় জীবন- মৃত্যুর দোলাচলে এবং বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের কাঁটাতারের বেড়া, পুশইন, ফারাক্কা তান্ডবসহ তাদের সীমান্তরক্ষীদের প্রতিদিনের বন্দুকের টার্গেট প্র্যাকটিসের গুলীর খোরাক হবার পর অর্থহীন পতাকা বৈঠক করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে বেঁচে থাকতে হবে অতীতের মতোই ক্ষমতাবানদের ভারবাহী বহন হিসেবে এবং অভাব অনটনে দাসানুদাস প্রজা হিসেবে। এদেশকে কিছুতেই স্বাবলম্বী হতে দেবে না ১৮/১৯ শতাব্দীর অচল আইন ও সেই আইনে পরিচালিত বিচার ব্যবস্থা। এদেশের জবাবদিহিতা বিহীন বিচার ব্যবস্থায় অনির্দিষ্টকাল বিনা বিচারে বন্দী, ক্ষতিপূরণ ছাড়া ২৫/৩০ বছর পর মামলার রায় প্রদান, আইন ভঙ্গ করলে দায়বদ্ধ হীনতা এবং ক্ষমতাবান কর্তৃক আইনের অপব্যবহার করে গরীবের সম্পদ লুণ্ঠনের যে মেধাবৃত্তিক সুযোগ আছে; ইসলামের দৃষ্টিতে ও জাতিসংঘের স্বীকৃত সংজ্ঞায় তা নির্যাতন হিসেবে পরিগণিত। প্রতারণাময় এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যবহার করে

www.pathagar.com

ক্ষমতাবানরা এদেশের কোটি কোটি মানুষকে নিপীড়ন করছে অবিরত। মানুষকে নিরন্ন ও সহায় সম্বলহীন করে রেখেছে। তাদের ন্যায্য অধিকারকে করেছে পদদলিত। অন্যদিকে শক্তিমান অপরাধীরা রয়ে যাচ্ছে শাস্তির উর্ধ্বে। আজ স্বাধীন জাতি হিসেবে আমরা তখনি যুগপৎ ক্ষুব্ধ, লজ্জিত ও অপমানিত হই যখন দেখি খোদ বৃটিশ প্রতিনিধি বাংলাদেশকে এসব মান্ধাতা বৃটিশ আইন আধুনিকায়নের তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও আমরা তা পরিবর্তন করি না। বাংলাদেশে নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার মিঃ জেমস পাউলার বলেছেন, " বাংলাদেশে সেই বৃটিশ যুগের পুরানো আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা আধুনিক যুগে একেবারে অচল। পার্লামেন্টে ঐকমত্যের ভিত্তিতে বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করাসহ পুরানো আইন সংস্কারের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা না গেলে এদেশে বিদেশী বিনিয়োগ আসবে না" (সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১০ মে ১৯৯৪)।

মাথা সুস্থ থাকলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক তেমনি বিচার বিভাগকে কার্যকর জবাবদিহিতার অধীনে আনা হলে পুলিশসহ রাষ্ট্রের সকল সেবা বিভাগ স্বাভাবিকভাবেই কার্যকর দায়বদ্ধতার অধীনে চলে আসতে বাধ্য। বিচার বিভাগে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা থাকলে সকল বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের আমলাতন্ত্রে কার্যকর দায়বদ্ধতার তীব্র তাগিদ অনুভূত হবে এবং কিছুতেই তা এড়িয়ে যাবার আর কোন পথ খোলা থাকবে না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধীনে থাকা বিচার বিভাগ ও আর কাউকেই দায়বদ্ধহীনভাবে সহজে ছেড়ে দেবে না; যা হবে সরকার ও দেশবাসীর জন্য বাড়তি পুরস্কার। আর এ জন্য প্রথমেই আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ ও বৃটিশ আইনগুলোর যুগোপযোগী সংস্কার ত্বরান্বিত করতে হবে। অন্যান্য বিভাগের চাইতে বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকায় একই সাথে উন্নত প্রশিক্ষণ এবং বিচারকগণের বেতন ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদিও বৃদ্ধি করতে হবে। এসব উদ্যোগ দুরূহ হলেও অসম্ভব নয়। ১৯৪৭, ১৯৭২ এবং ১৯৯০ সালে তিনবার প্রাপ্ত ঐতিহাসিক সুযোগ আমরা

www.pathagar.com

কাজে লাগাতে পারিনি। সবাই জোড়াতালি দিয়ে ভঙ্গুর স্থিতাবস্থা বজায় রেখে সময়টা কোনমতে পার করে যাচ্ছেন। এই জোড়াতালি দিতে কখনো সামরিক আইন আবার কখনো বা বিশেষ ক্ষমতা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জননিরাপত্তা আইন, দ্রুতবিচার আইনের মতো ক্ষণস্থায়ী ও বিতর্কিত আয়োজন করতে হচ্ছে। ঔপনিবেশিক আইন ও বিচার ব্যবস্থা আজকের আধুনিক যুগে এখন যে আর কাজ করছে না-এই ক্ষণস্থায়ী জোড়াতালির চাইতে আর বড় প্রমাণ কি হতে পারে ? ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য অনুকরণীয় কোন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়নি-হচ্ছেনা। ২০০১ সাল-এর ১ অক্টোবর জাতীয় নির্বাচনে ভূমিধ্বস বিজয়ের মাধ্যমে বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকারের সামনে সেই ঐতিহাসিক সুযোগটি আবারো ফিরে এসেছে যা হাতছাড়া করা যাবে না। সরকারের ভেতরের সংস্কার বিরোধী গোষ্ঠী বিশেষ করে আড়াই শতাব্দীর কায়েমী স্বার্থের বংশলতিকারা তথা বৃটিশ সৃষ্ট ভদ্রলোকদের নাতিপুতিরা এই উদ্যোগের প্রবল বিরোধিতা করবে। বাধা আসবে দেশী বিদেশী সেই বিশাল সুবিধাভোগী কোটারী গোষ্ঠীর তরফ থেকে, যারা স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশকে দরিদ্র ও দুর্বল বানিয়ে রেখে তাদের অক্টোপাসি শোষণ অক্ষুন্ন রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে বলে আশা করে। বর্তমান নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার জনগণকে সাথে নিয়ে এসব বাধা অনায়াসেই পরাভূত করে এগিয়ে যেতে পারবে; তবে তা নির্ভর করবে সরকারের সাহস ও সদিচ্ছার উপর। সকল বাধা পরাস্ত করে জনগণের এ সরকার এগিয়ে গেলে ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশবাসী আবারো সরকারের পেছনে ঐক্যবদ্ধ হবে, বদলে যাবে এ নষ্ট সমাজ, জাতীয় উদ্দীপনায় সৃষ্ট নবজাগরণে সমৃদ্ধ হবে দেশ এবং তা হবে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রকৃতপক্ষেই একটি নয়া ইতিহাস সৃষ্টির যুগান্তকারী ঘটনা। তাহলে আগামীতেও জনগণ সরকারকে পুনঃনির্বাচিত করে তার প্রতিদান দেবে এবং আমাদের পরবর্তী বংশধরগণ রেহাই পাবে বৃটিশ ঔপনিবেশিক এই বর্বর সিস্টেম থেকে। এ জন্য শুধু বিচার বিভাগ নয় - শাসন,

www.pathagar.com

প্রশাসন সহ নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে শক্তিশালী ও কার্যকর দায়বদ্ধতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৬৫ সালে দরিদ্র দেশ সিঙ্গাপুরের সর্বোচ্চ বিল্ডিংটি ছিল তিন তলা। বৃহত্তর ঢাকা জেলার চাইতেও আয়তনে ছোট প্রাকৃতিক সম্পদ বঞ্চিত সিঙ্গাপুরকে এক সময় বলা হতো এশিয়ার ধীবর পাড়া। সামুদ্রিক মাছের শুটকী রপ্তানী ছিল এই ক্ষুদ্র দ্বীপ রাষ্ট্রের প্রধান জাতীয় আয়। আজ সে দেশের আকাশচুম্বি বিল্ডিং এর সারি আর চোখ ধাঁধানো উন্নয়নের জৌলুস বিশ্বের কাছে ঈর্ষার বিষয় । রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বস্তরে কার্যকর জাবাবদিহিতা দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠা এবং প্রযুক্তিকে সম্বল করেই আজ সিঙ্গাপুরের জনগণ সুখী-সমৃদ্ধ। সম্মানিত বিচার ও নির্বাহী বিভাগসহ আমরা সকলেই কি এমন একটা সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতে পারি না ? মেঘে মেঘে তো ৩১ বছরের বেলা গড়িয়ে গেল ! ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর অসম্মান তো আমরা এখনই এড়াতে পারি।

শেষ করার আগে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টিও উল্লেখ না করলেই নয়। উন্নত সুসভ্য দেশগুলোর মতো আমাদের বিচার বিভাগকেও পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া উচিৎ। এর আগে ভাবতে হবে আমরা উন্নত সুসভ্য দেশগুলোর অবস্থানে আছি কিনা? আমরা ইচ্ছা করলেই পরমানু বোমা বানাতে কিংবা মঙ্গল গ্রহ অভিযানে যেতে পারি না। কারণ আমাদের সেই প্রযুক্তি, অর্থ ও সামর্থ নেই। এমন অবস্থায় বিচার বিভাগের ঢালাও স্বাধীনতা দেয়ার পরিবেশ ও সামর্থ আমাদের আছে কিনা তাও বিবেচনায় নিতে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে বিচার বিভাগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার আগে প্রথমেই কার্যকর জবাবদিহিতার অধীনে এনে বাংলাদেশকে উন্নত দেশগুলোর সমকক্ষ হবার কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করার পরই তা দেয়া ন্যায্য হবে। বর্তমান আইনমন্ত্রী এক গোলটেবিল বৈঠকে বলেছেন,- "বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দিলে মানুষের কি লাভ হবে? নিম্ন আদালতের দুর্নীতি অনিয়ম কি এতে দূর হবে? তিনি বলেন আমাদের জনসাধারণের কল্যানের জন্য বিচার বিভাগের আমূল পরিবর্তন নিয়ে ভাবতে হবে" (সূত্রঃ

www.pathagar.com

দৈনিক জনকণ্ঠ-১৯ অক্টোবর ২০০২) চলমান প্রেক্ষাপটে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখা সত্ত্বেও বলা যায়, বিচার ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের আগে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সামর্থের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দেয়া হলেও বাস্তবতা কখনোই তাকে টেকসই হতে দেবে না।

এ বইটি আমাদের মাননীয় বিচারকবৃন্দ ও সরকার উদারতা, দায়িত্ববোধ, বিচক্ষণতা, পান্ডিত্য এবং দেশ ও জনগণের প্রতি গভীর মমত্ববোধের দৃষ্টিকোণ থেকে সহৃদয়তার সাথেই বিবেচনা করবেন বলে আশা করা যায়।

সমাপ্ত